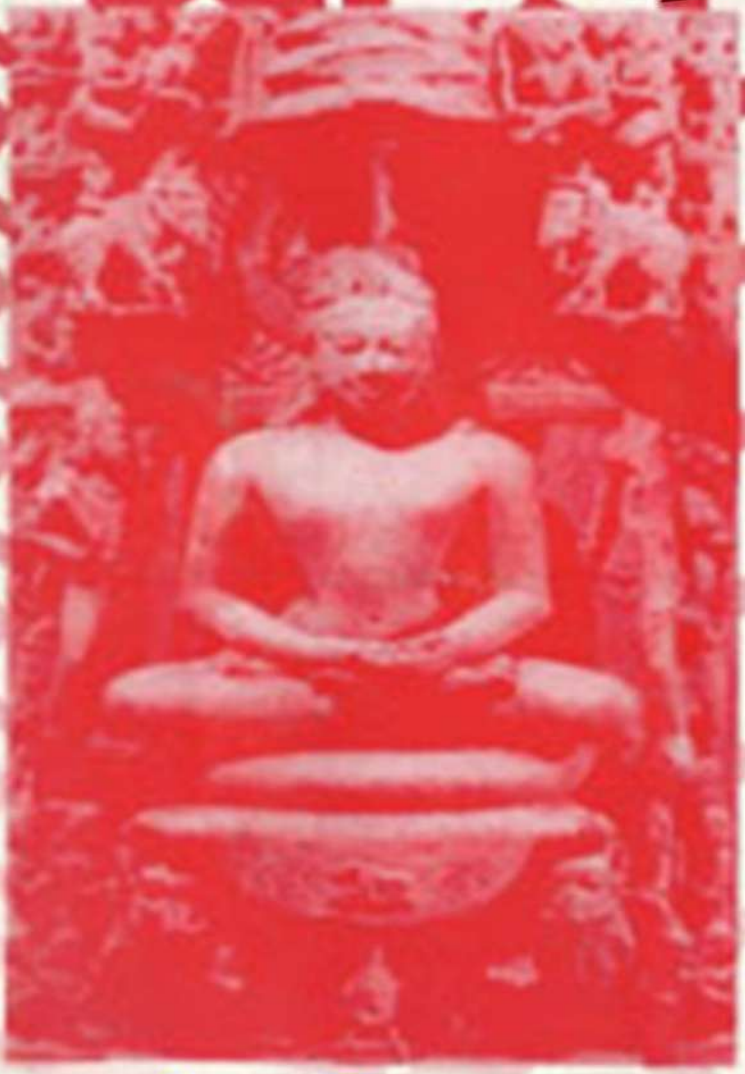

সুবর্ণ জয়ন্তী

সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ।। চৈত্র ১৪২৯

সম্পাদকীয়

সুধী পাঠকবর্গ,

সাদর জয় জিনেন্দ্র। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, অখণ্ড বঙ্গভূমির আদি আর্যধর্ম ছিল জৈন ধর্ম। তেইশতম তীর্থঙ্কর ভগবান পার্শ্বনাথ এবং চব্বিশতম তথা বর্তমান অবসর্পিণীর অন্তিম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর যে এই বঙ্গদেশে পদার্পণ করেছিলেন এবং এখানকার মানুষকে অহিংসা ও সত্যের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তার উল্লেখ যে কেবল বিবিধ সাহিত্যেয়ই মেলে তা নয়, উপরন্তু এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানও তাঁদের নামানুসারেই নামাঙ্কিত। অথচ বাংলার ইতিহাসের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি দীর্ঘদিন কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল। বিক্ষিপ্তভাবে কতিপয় পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করলেও সুসংহত এবং ধারাবাহিক চর্চার অভাবে এখানকার অধিবাসীরা তাঁদের আদি ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার সুযোগ পান নি। এই পরিস্থিতিতে অখণ্ড বঙ্গভূমি এবং সন্নিহিত এলাকায় শ্রমণ ধর্মের প্রাচীনতাকে এবং সেই ধর্মের বিভিন্ন দিককে বাঙালির কাছে তুলে ধরার এবং এই বিষয় নিয়ে চর্চা করার একটি মাধ্যম হিসাবে ১৩৮০ বঙ্গাব্দের শুরুতেই আত্মপ্রকাশ করে 'শ্রমণ' পত্রিকা। তারপর থেকে এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রখ্যাত লেখকের বহু উচ্চমানের লেখার মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে যে, শ্রমণ সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনতম বাংলার আদি সংস্কৃতি।

কোলকাতার 'জৈন ভবন' থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রথিতযশা বিদ্বান শ্রী গণেশ লালওয়ানির হাত ধরে। তিনিই ছিলেন 'শ্রমণে'র প্রথম সম্পাদক। লালওয়ানিজী'র সুয়োগ্য সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি অচিরেই বিদ্বৎসমাজে সাদরে গৃহীত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা এর দ্বিতীয় সম্পাদক রূপে পাই প্রাকৃত ভাষা এবং জৈন সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে।

নিজের মূল সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে জানার জন্য 'শ্রমণ'ই বাঙালির একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রেরণাস্রোত। ইতিহাস ও সংস্কৃতির জগতে এই পত্রিকার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে, শ্রমণ প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তীকালে বহু গবেষকের গবেষণায় এই পত্রিকা থেকে গৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে।

এতদ্ব্যতীত এই পত্রিকার দ্বারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ভব হয়েছে । বাংলার সংস্কৃতিজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও পূর্বোল্লিখিত আদি ধর্মের অনুসারী এক বাঙালি জনগোষ্ঠী

হাজার ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে আজও নিজেদের জৈনত্বকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু চর্চার সুযোগের অভাবে নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের উত্তরাধিকার, ইত্যাদি সবই তাঁরা ভুলতে বসেছিলেন। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে তাঁরা হারিয়ে ফেলছিলেন তাঁদের নিজস্ব পরিচিতি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বেশ কিছু গ্রামে এই জনগোষ্ঠীর বসবাস; এঁরা সরাক নামে পরিচিত। 'শ্রমণ' পত্রিকাতেই নতুন করে সরাক- সংস্কৃতির বিষয়ে বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্যসমৃদ্ধ রচনার মাধ্যমে যেমন সরাক জনজীবনকে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল, তেমনই সরাক জাতির মানুষের কাছেও নিজ ইতিহাস চর্চার একটা সুয়োগ এনে দিয়েছিল এই পত্রিকা। বহু সরাক বিদ্বান এই পত্রিকায় কলম ধরেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন প্রকাশ হয়ে চলার পরও কিছু সমস্যার কারণে পত্রিকাটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে য়ায়। তারপর থেকে অনেকেই পত্রিকাটির পুনঃ প্রকাশের জন্য বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। আমরা এই অনুরোধ স্বীকার করতে চাইলেও বাস্তব সমস্যার কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষমেশ নিজের অন্তরের তাগিদেই আবার উদ্যোগ নিলাম এই পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ করার; ফলশ্রুতিতে আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের সহয়োগিতায় এ'বছরের শুরুতেই বৈশাখ মাসে এই পত্রিকা পুনরায় নবরূপে প্রকাশিত হতে শুরু করল। প্রয়ুক্তির অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে এবার থেকে ই-পত্রিকা রূপে 'শ্রমণে'র পুনরায় পথ চলা শুরু হল, যাতে বিনা শুল্কে সকলের কাছে এ পৌঁছে যেতে পারে।

নিজের পঠনপাঠনসংক্রান্ত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার মাঝেও য়ে নিয়মিত এই পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে, তাঁর জন্য বিশেষভাবে একজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি হলেন সরাক জাতিভূক্ত একজন স্বধর্মানুরাগী শিক্ষক শ্রী সুখময় মাজী। এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে তিনি সম্পাদনার কাজে আমাকে যথেষ্ট সহয়োগ করার কারণেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছি। আজ এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করার কাজ অনেকটাই সহজ হল, তাঁর সহযোগিতার কারণে।

পরিশেষে, এই সংখ্যা সম্বন্ধে এবং নিয়মিত সংখ্যাগুলি সম্বন্ধেও মতামত জানানোর জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

মহাবীর জয়ন্তী, ১৪২৯
কোলকাতা

আন্তরিক শুভকামনা সহ
ডঃ লতা বোথরা, পিএচ্. ডি, ডি. লিট্।

ISSN: 0975-8550

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

॥ চৈত্র ১৪২৯ ॥ চতুর্থ তথা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ॥

সূচীপত্র

1. ক্ষমা ধর্ম	:	ডঃ লতা বোথরা	01
2. ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়	:	মুনিশ্রী শীলপ্রভ	09
3. প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা	:	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	22
4. পণিত ভূমিতে লেখা	:	পুরাতন সংখ্যা থেকে	31
5. জৈনধর্ম ও তীর্থঙ্কর মতাদর্শ	:	মুহাম্মদ তানিম নওশাদ	33
6. আচার্য পাত্রকেশরীর কথা	:	সুখময় মাজী	35
7. জৈন ধর্ম; সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে	:	রজত সুরাণা	40
8. আগম পাঠ; ভগবতী সূত্র	:	শ্রীকান্ত জৈন	44

সম্পাদিকা

ডঃ লতা বোথরা

সহ-সম্পাদক

শ্রী সুখময় মাজী

For articles , reviews and correspondence kindly contact –

Dr.Lata Bothra

Chief Editor

Mobile no-9831077309,

ক্ষমা ধর্ম

- ডঃ লতা বোথরা

কোনও বস্তুর মূল স্বভাবকেই তার ধর্ম বলা হয়। আত্মার মূল স্বভাব সমতা; সেই জন্য জৈন আগম গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে সমতাকেই ধর্ম বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাধনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত সমতার প্রাপ্তি। অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যাতে সমতা ভাব সর্বদা বিদ্যমান থাকে, সেটাই আমাদের সাধনার উচ্চতম লক্ষ্য। সমতার কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আমরা পাই। **"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে"**। এখানে সমতাভাবের কথাই বলা হয়েছে – সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা; কারো প্রতি আসক্তি বা বিদ্বেষ না রাখা। জল না দিলে যেমন কোনও গাছ ফল দেয় না, তেমনই হৃদয়ে ক্ষমা ভাব না থাকলে সমতার উপলব্ধি হতে পারে না। অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে সমতার ভাব আনতে হলে হৃদয়ে সবচেয়ে আগে ক্ষমার ভাবনা জাগরিত করতে হবে। ক্ষমা ভাবনা ছাড়া কোনও সাধনাই সফল হতে পারে না। যারা অহিংসা ধর্মের পালক অর্থাৎ যাঁদের কাছে **"অহিংসা পরমো ধর্ম"**, তাঁরাই ক্ষমশীল হতে পারেন। অতএব, ক্ষমা হচ্ছে সেই সাধন, যা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। ক্ষমার এই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখেই আচার্য উমাস্বাতীর তত্ত্বার্থসূত্রে দশ ধর্মের মধ্য ক্ষমার কথা সর্বাগ্রে বলা হয়েছে। সেখানে যে দশটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল, ক্ষমা, মার্দব, আর্জব, শৌচ, সন্তোষ, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন্য এবং ব্রহ্মচর্য। তাহলে, সর্বপ্রথম ধর্ম হল ক্ষমা।

এখন প্রশ্ন হল, ক্ষমা কাকে বলব? আমাদের মনের সেই ভাবনাকেই ক্ষমা বলা হয়, যে ভাবনার মধ্য দিয়ে বা যে ভাবনার বলে বলীয়ান হয়ে একজন মানুষ অন্যের দেওয়া কষ্টকে অবিচলিতভাবে সহ্য করে নেয় এবং যে কষ্ট দিচ্ছে, তার প্রতি মনের মধ্যে কোনও বিকার বা বিদ্বেষ রাখে না। ক্ষমার ফলে, যিনি ক্ষমা করছেন, তিনি যে আধ্যাত্মিক সন্তুষ্টি পান, সেই সন্তুষ্টি তাঁকে উৎকৃষ্ট সাধনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলেই জীব ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, দ্বেষ, ইত্যাদি কষায় থেকে নিজেকে মুক্ত হতে পারে। ক্রোধ, মান , মায়া , লোভ, ইত্যাদি কষায়গুলিকে শান্ত করার জন্য ক্ষমা ধর্মের অবলম্বন নেওয়া খুব জরুরি। মহান সন্ত কবীর বলেছেন – **জহাঁ দয়া তহঁ ধর্ম, জহাঁ লোভ তহঁ পাপ, জহাঁ ক্রোধ তহঁ কাল, জহাঁ ছিমা তহঁ আপ;** অর্থাৎ যেখানে দয়া,

সেখানেই ধর্ম; যেখানে লোভ, সেখানেই পাপ; যেখানে ক্রোধ সেখানেই বিনাশ; এবং যেখানে ক্ষমা সেখানেই পরমাত্মা বা মোক্ষ। তাই জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণের চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে মন, বচন এবং কায়ার দ্বারা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ক্ষমাভাবনাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করা দরকার। কেননা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি একমাত্র ক্ষমা সাধনার মধ্য দিয়েই হতে পারে। ক্ষমা সূত্রে লেখা আছে **জং জং মণেণ কায়েণ চিন্তিয় বায়াই ভাসিয়ং কিঞ্চি, অসুহং কায়েন কয়ং মিচ্ছামি দুক্কড়ং তস্স**। অর্থাৎ, আমি মনে মনে যে সব অশুভ চিন্তন করেছি, বাক্যের দ্বারা যে সব অশুভ কথা বলেছি, এবং শারীরিক ভাবে যে সব অশুভ কাজ করেছি, সেই সব কিছুর জন্য মিচ্ছামি দুক্কড়ং অর্থাৎ আমার সব দুষ্কৃতি মিথ্যা হোক। এগুলির জন্য আমি কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চাইছি।

জীবনকে সুন্দর রাখার জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী শৈলী হল ক্ষমা। ভারতবর্ষে পরম্পরাগতভাবে ক্ষমাকে পরম তপ বলা হয়েছে। আমরা বৌদ্ধ ধম্মপদে দেখতে পাই, **"খন্তি পরমং তপ তিতিক্ষা"** (ধম্মপদ/১৮৪)। সংযুক্তনিকায়ে বলা হয়েছে, স্বয়ং বলবান হয়েও দুর্বলের কথা সহ্য করাই হল শ্রেষ্ঠ ক্ষমা। আচার্য শান্তিরক্ষিত 'শান্তিপারমিতা' গ্রন্থে ক্ষমাধর্মের অত্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বৈদিক পরম্পরাতেও আমরা দেখি, ভগবান মনু দশ ধর্মের মধ্যে ক্ষমাকেও একটা ধর্ম হিসেবে গণ্য করেছেন। গীতাতে তো ক্ষমাকে ভগবানেরই অন্যতম বৃত্তি বলা হয়েছে। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ক্ষমা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ক্ষমা হল অসমর্থ লোকেদের গুণ এবং সমর্থ লোকেদের ভূষণ। এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে আমরা পাই। মহাভারতে বলা হয়েছে, **"ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভুতং চ ভাবী চ; ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচঃ ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ"** (বনপর্ব/৩৭০) । অর্থাৎ ক্ষমা ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্যা, ক্ষমা ভূত, ক্ষমা ভবিষ্যৎ; ক্ষমাই হল তপ, ক্ষমাই হল পবিত্রতা, আর, ক্ষমাই জগৎকে ধারণ করে রেখেছে। এর আগেরই একটা শ্লোকে বলা হয়েছে **"ক্ষমা ধর্ম ক্ষমা যজ্ঞ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতং। য এতদেবং জানাতি স সর্বং ক্ষন্তুমর্হতি"**।

খ্রিস্টধর্মেও আমরা ক্ষমার মহত্ত্ব দেখতে পাই। একবার যীশু খ্রিস্টকে তাঁর এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "How many times should a man forgive his brother? Seven times"? যীশু তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, "I do not say seven times, but seventy times seven". অর্থাৎ যীশু অনন্তবার ক্ষমা করতে বলেন। বাইবেলে এক জায়গায় লেখা আছে, যে

অন্যকে ক্ষমা করে, সে ঈশ্বরের ক্ষমা পায়; আর ঈশ্বর যাকে ক্ষমা করে দেন, সে ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার সাথে সাথে নিজের সব শত্রুকে ক্ষমা করে দিতে পারে।

ইহুদি ধর্মেও বছরে দশটি দিন ক্ষমা ও অনুতাপ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই দশ দিন ইহুদিরা নিজেদের পরিজন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে ক্ষমার আদানপ্রদান করে। The ten days of repentance or the days of Awe include Ross Hashanah, Yom Kippur and the days in between, during which Jews should meditate on the subject of the holidays and ask for forgiveness from anyone they have wronged.

নিজেকে ক্ষমা করাই অপরকে ক্ষমা করা – এমনটা বলা যেতেই পারে। যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে, সে'ই প্রকৃত ক্ষমাশীল এবং সে মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়ার দরকার আছে। নিজেকে ক্ষমা করা মানে এটা নয় যে, আমি এক এক বার এক একটা কুকৃত্য করব এবং এই কুকৃত্যের জন্য নিজেকে ক্রমাগত ক্ষমা করে চলব। এ'রকম বললে সেটা অপব্যাখ্যা হবে। কথাটার আসল তাৎপর্য হল, যদি আমি কোনও কারণে নিরুপায় হয়ে কোনও গর্হিত কাজ করে ফেলি, তাহলে আত্মগ্লানিতে ভোগার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি সেটার জন্য অনুতাপ করব, আগামীতে এ ধরণের ঘটয়া যাতে আমার দ্বারা না ঘটে সেটা আমি নিশ্চিত করব এবং যেটা ঘটে গেছে, তার জন্য নিজেকে ক্ষমা করে দেব। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বক পরিস্থিতির চাপে আমার দ্বারা কোনও নিন্দনীয় কাজ ঘটে গেছে। তখন মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকে, নিজেকে সমাজ থেকে গুটিয়ে নেয় এবং অনেক সময় আত্মহত্যার মত মহাপাপও করে ফেলে। এই জায়গাতেই নিজেকে ক্ষমা করার গুরুত্ব রয়েছে। হ্যাঁ, নিন্দনীয় কাজটা ঘটে গেছে ঠিকই, কিন্তু এটার জন্য আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত; আগামী দিনে যাতে এ'রকম কাজ আমার দ্বারা পুনরায় না ঘটে সেজন্য সতর্ক থাকব, আর যেটা ঘটে গেছে, তার জন্য নিজেকে ক্ষমা করে দিলাম। তাহলেই মনের মধ্যে আর কোনও আত্মগ্লানি থাকবে না। এর অর্থ এটাই যে, ক্ষমা নিজেকেও করতে হবে, অপরকেও করতে হবে। ভগবান মহাবীরের জীবনচরিত দেখলে বোঝা যায়, তার জীবনে ক্ষমা করার ভাবনা একেবারে চরমরূপ পরিগ্রহ করেছিল। অত্যন্ত ভয়ংকর উপসর্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেইও সব উপসর্গগুলিকে সমতা ভাবের সাথে সহন

করেছিলেন, এবং নিজেকে ক্ষমা ভাবনায় অটল রেখে কষায়গুলিকে সংযমিত করে ধ্যানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভগবান মহাবীরের পুরো ছদ্মস্থ জীবনটাই, ক্ষমা ভাবনার অপূর্ব উদাহরণ। গোয়ালা যখন মহাবীরের কানে কাঠের তীক্ষ্ণ শলাকা ঠুকে ঠুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, প্রভুর মনের মধ্যে তখন কিন্তু সেই গোয়ালার প্রতি কোনও বিদ্বেষ জন্মায় নি। সেই অসহ্য যন্ত্রণা তিনি সমতার সঙ্গে সহ্য করেছিলেন। আবার যখন একজন কবিরাজের দ্বারা ঐ কাঠে শলাকাটা কান থেকে বের করা হল, তখনও তিনি প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু না ছিল তার গয়ালার প্রতি বিদ্বেষ, না ছিল সেই কবিরাজের প্রতি অনুরাগ। এই কষ্টদায়ক পীড়া সহ্য করে উনি ক্ষমা ভাবনায় সমাহিত ছিলেন, যেটা একজন সত্যিকারের বীরপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। এই জন্য ভগবানকে যেমন মহাবীর বলা হয়, তেমনি তাঁকে ক্ষমাবীর বলা হয়।

আসলে ক্ষমা হল প্রকৃত বীরের ভূষণ। ক্ষমা সেই সাপকেই শোভা পায়, যে সাপের বিষ আছে। বাবুরাম সাপুড়ের "যে সাপের চোখ নেই, সিং নেই, নোখ নেই" জাতীয় নির্বিষ সাপের ক্ষমা করা বা না করার কী গুরুত্ব আছে! হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি রামধারী সিং দিনকর তাঁর একটি কবিতায় সুন্দরভাবে এটি তুলে ধরেছেন –

ক্ষমা শোভতী উস ভুজঙ্গ কো
জিসকে পাস গরল হো;
উসকো ক্যা, জো দন্তহীন
বিষরহিত বিনীত সরল হো?

ক্ষমার ভাবনা মহাবীরের মধ্যে এতটাই অধিক ছিল যে, গোশালক যখন ভগবান মহাবীরের উপর তেজোলেশ্যা নিক্ষেপ করল, তখনও ভগবান কিন্তু ক্রুদ্ধ হন নি; ক্ষমার ভাবনাতেই লীন ছিলেন। এটা ওনার ক্ষমাভাবনার সাধনার পরাকাষ্ঠা, বলতেই পারি। শ্রী চন্দ্রপ্রভ সাগরজী মহারাজ মহাবীরের ক্ষমা ভাবনার উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন, **"এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক অপূর্ব সত্য প্রকাশিত হল। রক্ত পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য একটা অবিরল ধারা বয়ে চলেছে! এটা কি রক্ত! না, পীযূষধারা! ক্ষমার অনুপম স্রোত, যার স্তম্ভ হচ্ছে আত্মসম্বল। করুণার প্রতিবিম্ব, দয়ার সাগর! অহিংসার অমর গায়ক! খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন; নির্ভয় নিশ্চল মহাবীর। ক্রোধের জ্বালা আর ক্ষমার অমৃতদুগ্ধধারা! লোহা আর পরশ পাথর। চণ্ডকৌশিক আর মহাবীর।**

কিন্তু কী ঘটল! ক্রোধের উপর ক্ষমার, হিংসার অপর অহিংসার অপূর্ব বিজয়! ক্ষমার কী অদ্ভুত মহিমা"!

নিজেকে ক্ষমা করাই নিজেকে সম্মান করা। ভগবান মহাবীর যখন গণধর গৌতম স্বামীর মত উচ্চ মার্গের সাধককে একজন গৃহী আনন্দ শ্রাবকের কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠাচ্ছেন, তখনই ক্ষমার অপরিসীম মহত্ত্ব বোঝা যায়। ক্ষমার ভাবনা সমস্ত মানবিক ভাবনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সংবেদনশীলতা, করুণা, মমতা, সহনশীলতা, বিনয়, এই সব গুণ যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরাই ক্ষমা করতে পারেন; তাঁরা ক্ষমা চাইতেও পারেন। ভগবান মহাবীর যে কেবলমাত্র মানুষের প্রতিই ক্ষমাকে সীমিত রেখেছিলেন, তা নয়। বরং একেন্দ্রিয় জীব, দ্বীন্দ্রিয় জীব, ত্রীন্দ্রিয় জীব, চতুরিন্দ্রিয় জীব এবং সমস্ত প্রকার পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের কাছেই ক্ষমা চাওয়া এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব তিনি বারবার নির্দেশ করেছেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আহরণ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গ্রহণ – সেটা জলই হোক বা খনিজ পদার্থ অথবা বনস্পতি, সবকিছুর জন্যই ক্ষমারূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে সব থেকে বিস্তৃত রূপে পাওয়া যায়। নিজের প্রয়োজনের অধিক কোনও কিছু সংগ্রহ করা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংসাধনের উপযোগ করা ঠিক নয়। এবং সেই সব ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। আর, এটা জৈন জীবনশৈলীতে নিত্য প্রতিক্রমণ ও সামায়িকের মধ্য দিয়ে করা হয়। বন্দিতুং সূত্র এর একটা সশক্ত উদাহরণ। এই সূত্রের উদ্দেশ্যই হল নিজেকে ক্ষমাশীল বানানো।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বলা হয়েছে, ক্ষমা করার ফলে মানসিক প্রসন্নতা লাভ করা যায়। আর, মানসিক প্রসন্নতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সব প্রাণ, ভূত, জীব এবং সত্ত্বার সাথে মৈত্রী অনুভব করে। যে জীব এই মৈত্রীর অনুভূতি লাভ করে, সে তার চিন্তনকে পরিশুদ্ধ করে একেবারে নির্ভয় হয়ে যায়।

দুর্গাসপ্তশতী গ্রন্থে 'ক্ষমাপ্রার্থনা' নামক একটা অধ্যায় আছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, **"হে মাতা! আমার দ্বারা অজ্ঞানবশতঃ, ভুলবশতঃ অথবা বুদ্ধিভ্রমের কারণে যে হাজার হাজার অপরাধ হয়েছে, সেই সব অপরাধগুলি তুমি ক্ষমা কর"**। এখানে লক্ষ্যণীয় যেটা, তা হল, আমরা নিজের অজান্তে যে পাপগুলি করে ফেলেছি, তারই প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হচ্ছে। কেননা অজ্ঞাতসারে যে পাপগুলি আমাদের দ্বারা ঘটে, সেগুলি আমরা বুঝতে পারি না। যেমন, একটা টবের চারাগাছে যখন আমরা জল দিই, তখন সেই টবের মধ্যে কিছু পিঁপড়ে অথবা ক্ষুদ্র প্রাণী থাকতেই পারে,

যেগুলি হয়তো আমাদের চোখে পড়ে না, আমার প্রদত্ত জলে ডুবে তাঁরা অনেক সময় মারা যায়। ফলে আমার অজান্তেই প্রাণীহত্যার পাপ আমার উপর বর্তায়। কিন্তু এই পাপটা আমার অজান্তেই ঘটে, যার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি।

ক্ষমা একটা ঔষধও বটে। যদি আপনাকে কেউ কোনও কষ্ট দেয়, তবে সেটার সবচেয়ে বড় ঔষধ হল ক্ষমা। আবার আপনি যদি কাউকে কোনও কষ্ট দেন, তাহলে তারও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হল ক্ষমা। Forgiveness is about goodness; about extending mercy to those who've harmed us, even if they don't deserve it. ক্ষমার ভাবনা একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বা সাইকলজিক্যাল হিলিংয়ের কাজ করে। বলায় হয়, Act of Forgiveness can reap huge rewards for your health lowering the risk of heart-attack, improving cholesterol level and reducing pain, blood pressure and level of anxiety, depression and stress.

আমার এক পরিচিত মহিলা আছেন, যিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। উনি যখন তাঁর এই মারণ রোগের বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন থেকে উনি রাতদিন ক্ষমা ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে শুধু ইরিয়াবহিয় সূত্র আবৃত্তি করতেন। এ'রকম করতে করতে একদিন দেখা গেল, তিনি অনেকটাই সুস্থতা অনুভব করছেন। অর্থাৎ এই যে ক্ষমা ভাবনা, তা আমাদেরকে মানসিকভাবে এতটাই প্রশান্তি এনে দেয় যে, তাঁর প্রভাবে শারীরিক অসুস্থতাও অনেকটাই দূরীভূত হতে পারে। আমাদের জৈনদের সল্লেখনা বা সান্থারা নামে যে প্রশান্তমৃত্যুর প্রক্রিয়া আছে, সেই সান্থারাতেও নিজেকে ক্ষমা ভাবনায় স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে। যদি সল্লেখনায় মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বসে কেউ মনকে স্থির রাখতে না পারেন তবে তাঁর সল্লেখনা বৃথা হয়ে যায়। এই রকমই বেনারসে 'কাশী লাভ মুক্তিভবন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে মানুষ তাঁদের শেষ সময়ে দু সপ্তাহের জন্য আসেন জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে। সেই সময় তাদেরকে যে কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্ষমা ভাবনা। অন্যকে ক্ষমা করা আর সকলের কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

আজকের দিনে বহুল প্রচলিত রেইকি হিলিং, বিপশ্যনা, প্রাণিক হিলিং-এর মত যে সব উপচার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, সেগুলিতেও ক্ষমার ভাবনাই দেখা যায়। আজ থেকে প্রায় পনের

বছর আগে যিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রাণিক হিলিংয়ের কোর্স করে আসা আমার এক বন্ধু আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সেখানে যা শেখানো হয়, সেগুলো একেবারেই আমাদের সামায়িক আর প্রতিক্রমণের মত; বিশেষ করে মুখপট্টি ও পড়িলেহনের নিয়ম। আজ আমি নিজে রেইকি মাস্টার হওয়ার কারণে জীবনে ক্ষমার গুরুত্ব খুব ভাল রকম অনুধাবন করতে পারি। আজকের অনেক মনোবিদ ও মনঃচিকিৎসক Past Life Regression পদ্ধতিতে ক্ষমার সাহায্যে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করেন এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ খানিকটা সফলও। আমিও এটা অনুভব করেছি। আমাদের আচার অনুসারে যখন আমরা ক্ষমাপনা করি, তখন আমাদের পূর্বজন্মে যে সব পাপকর্ম আমরা করেছি, সেগুলির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি।

চিরংসঞ্চিয়ং পাব পণাসণীই ভব ভয় সহস্স মহনীয়ে।
চউবিস জিন বিণিগ্গয় কহাই বোলন্তু মে দিয়দা।

অর্থাৎ, দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত পাপ কর্মকে যা নষ্ট করতে পারে আর লাখ লাখ জন্মমৃত্যুর চক্রকে যে বিনাশ করতে পারে, সেই চব্বিশ জিনেশ্বরের মুখনিঃসৃত কথায় যেন আমার দিন ব্যতীত হয়।

আমরা যখন ক্ষমা যাচনা করি, তখন তার মধ্যে সমস্ত জীবজগৎ অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমরা যদি ক্ষমার গুরুত্বকে বুঝে নিতে পারি,তাহলে ডিপ্রেশন অথবা মানসিক অস্থিরতার অবসান হয়ে যায়। আজকে হতাশা, মানসিক অস্থিরতা, ইত্যাদি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে। অতীতের ক্রোধ, ভবিষ্যতের ভয় যে, কাল কী হবে, বর্তমান থেকে পলায়ন প্রবৃত্তি, প্রকৃতিকে নিয়ে ছেলেখেলা, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্নতা এবং কেবল নিজের আত্মতুষ্টির বিষয়েই ভাবনা চিন্তা করা অসুস্থতার পরিচায়ক। আজ এই সব নেতিবাচক চিন্তাভাবনার কারণেই সারা পৃথিবী সন্ত্রস্ত। সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কেবল, নিজের জন্যই সুরক্ষার ভাবনা সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বিপজ্জনক রোগের উৎপত্তি এবং পরিবেশ বিনাশের একটা বড় কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। মানবতাকে এই ভীষন আতঙ্কজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের তীর্থঙ্কর ভগবানদের নির্দেশিত পথে চলা প্রয়োজন। অন্যের কাছ থেকে আমি যে ব্যবহার প্রত্যাশা করি, ঐ একই ব্যবহার আমাদের অন্যের প্রতি করা দরকার। **"পরস্পরোপগ্রহ জীবানাম্"**- এই সিদ্ধান্তের উপরই আমাদের চলা উচিত। আমাদের চারপাশে ব্যাপ্ত যে পরিবেশ, তার সামান্যতম ক্ষতিও যেন আমার দ্বারা না হয়, পরিবেশের কোন উপাদানই আমার

দ্বারা যেন পীড়িত না হয়, সবার প্রতি আমরা যেন সংবেদনশীল হই এবং সকলের প্রতি যেন ক্ষমাভাব রাখি। ভগবান মহাবীর আচারাঙ্গ সূত্রে বলেছেন, কোনও জীবকে হত্যা করো না। জোর করে কাউকে নিজের আজ্ঞানুবর্তী করো না, কাউকে সন্তপ্ত করো না, কাউকে পরিতপ্ত করো না। এই ধর্মই নিত্য, শুদ্ধ ও শাশ্বত ধর্ম। আমাদের ভেতর সংবেদনশীলতার আবির্ভাব হলেই আমরা ক্ষমাশীল হতে পারি। গুজরাটের প্রসিদ্ধ কবে নরসিংহ মেহতা এই মানবধর্মের তাৎপর্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, **"বৈষ্ণব জন তো ত্যায়নে কহিয়ে যে পীর পরাই জানে রে"**। যে অপরের পীড়াকে বঝে, সে'ই সংবেদনশীল, করুণাশীল এবং ক্ষমাশীল। ভগবান মহাবীর সারা বিশ্বের সামনে ক্ষমা ধর্মের যে রাজপথ দেখিয়েছেন, সেটাই আজকের সমস্ত জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান। তীর্থঙ্করদের দ্বারা প্রতিপাদিত ক্ষমাধর্মের মাধ্যমেই আমরা জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে পারি।

দ্বিতীয়বার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, "কারো প্রতি কোনও দুর্ভাব নয়, সবার প্রতি উদারতা এবং প্রভুর দেখানো পথে দৃঢ়তার সাথে আমরা চলব"। তাঁর এই বক্তব্য ক্ষমা ভাবনাকেই তো প্রকাশ করেছে। সমস্ত জীব বাঁচতে চায়, মরতে কেউই চায় না। পৃথিবীতে প্রেম, অভয় এবং শান্তির জন্য আমাদের ক্ষমাধর্মের ভাবনাকে সঠিকরূপে বুঝতে হবে। কেননা ক্ষমারূপ বিশাল গঙ্গায় অবগাহন করেই আমরা মানবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হব। জাতিধর্মবর্ণসম্প্রদায় নির্বিশেষে সব রকম ভেদাভেদের উপরে উঠে "মিত্তি মে সব্বভুএসু বৈরং মজ্ঝং ন কেণই" - সর্বভূতের সাথেই আমার মৈত্রী; কারো সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই – এই ভাবনা সমস্ত রকম বিদ্বেষকেই সমাপ্ত করতে সক্ষম। এটাই ক্ষমাধর্ম, এটাই মানবতা,এটাই মুক্তির মহামার্গ। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের উৎপীড়নে আতঙ্কিত মানবতার এটাই ত্রাণ, এটাই শরণ, এটাই প্রতিষ্ঠা। সবশেষে বলব -**সব্বস্স জীবরাসিস্স ভাবও ধম্ম নিহি অনি অচিত্তো সব্বং খমাবইত্তা খমামি সব্বস্স অহমপি**। অর্থাৎ, ধর্মে মনকে স্থির করে সম্পূর্ণ জীবজগতের কাছে আমি নিজের অপরাধের ক্ষমা চাইছি এবং আমি নিজেও তাদের সমস্ত অপরাধ হৃদয় থেকে ক্ষমা করছি।

ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়; সরাকদের বিশ্বস্ততার কাহিনী

মুনি শ্রী শীলপ্রভ মহারাজ

সেই কোন সুদূর অতীতে সমাজের নিয়ম-নীতি তৈরি হয়েছিল ও কাদের দ্বারা হয়েছিল তা হয়তো আজ বলা সম্ভব নয়, কিন্তু যারা তা করেছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁরা সমাজের আদিপুরুষ; সুতরাং তাঁরা প্রণম্য। জৈন পুরাণে সমাজের আদিপুরুষ হিসাবে কুলকরদের কথা এবং সভ্যতার আদিপুরুষ হিসাবে ভগবান ঋষভদেবের কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত থাকায় আমরা সেটা বিশ্বাস করি এবং সুদৃঢ় ভাবেই করি। কিন্তু জৈন কাহিনী ও কিংবদন্তীকে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত হিসাবে মেনে নেওয়ার দায়বদ্ধতা নিরপেক্ষ পাঠকের থাকে না। সেজন্য প্রয়োজন বহুজনগ্রাহ্য সাহিত্যিক বা পুরাতাত্ত্বিক প্রমান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সরাক সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের কোনও লিখিত প্রমাণ নেই; অন্তত আমার কাছে । হয়তো বা যদি কোথাও কখনও ছিল, কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে; থাকলে হয়তো বর্তমানকে মেলাতে অনেক সুবিধা হতো। কিন্তু যারা এখনো বহু প্রতিকূলতা সহ্য করেও, ক্রমাগত বহু রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের ব্যথার কথা কোথাও যদি না লিখি, তবে অন্যায় হবে; অন্তত নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী বলে মনে হবে । তাই বর্তমান সরাক সমাজ অর্থাৎ পুরুলিয়া, ধানবাদ, বোকারো, বীরভূম, ইত্যাদি এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন, যাঁরা মূলত মানবাজার এলাকা থেকে দুটো বর্গী আক্রমণের আগেই মানবাজার থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, এখানে শুধু তাঁদের কথাই লিখব। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং সাঁওতাল পরগণার সরাক সমাজের ইতিহাসটাও প্রায় একই রকম। আর উড়িষ্যার সরাকদের ইতিহাস একটু আলাদা; তাই সে বিষয়টি আপাততঃ অনুল্লিখিতই রেখে দেওয়া হল। সরাক জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিরা শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্রনাথ সরাকের 'সরাক জাতির হারানো ইতিহাস' বইটা দেখলে অনেক তথ্য পাবেন। এই এলাকার সরাকরা মানবাজার এলাকা থেকে চলে আসতে কেন বাধ্য হয়েছিলেন, সেটাও আপনারা উক্ত মহাগ্রন্থ থেকেই জানতে পারবেন। উক্ত পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করার সুযোগ নিতান্তই কম। এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রবাবুর কিছু কাজ সম্পর্কে একটু উল্লেখ প্রয়োজন। সেই সময় তিনি জৈন ধর্মের আরও দুটি মূল গ্রন্থ গুজরাতি ও হিন্দি ভাষা থেকে

বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। নিজে সরাক পরিবারের সন্তান হওয়ায় সরাক-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যকরূপে তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল। বৃহত্তর জৈন সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদে জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ বিষয়েও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। স্ব-আরোপিত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি তাই তাঁর সাহিত্যিক কাজগুলি করেছিলেন। আচার্য শ্রী সুযশ মুনি মহারাজের প্রেরণা এবং আশীর্বাদে উনি বেশ কিছু গ্রন্থের সুললিত বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। ওঁর অনুদিত 'কল্পসূত্র' ও 'বার্সাসূত্র' এখনও মধুবনের জাহাজ মন্দির সরাক ভবনে পাওয়া যেতে পারে।

সরাক জাতির ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের অনেক ঘটনাই আমাদের জানা ইতিহাসের বাইরে থেকে যায় বিভিন্ন কারণে। সেই রকম ইতিহাসের 'কাব্যে উপেক্ষিতা' কিছু অনালোচিত অধ্যায় পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরার জন্যই আমার এই প্রয়াস। তারই গৌরচন্দ্রিকা সেরে ফেলার পর এবার সেই মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

অনেক ঘটনা। একটি ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করি; তার পূর্বের ও পরের ঘটনাগুলো পরে বললেও চলবে। বাংলায় বর্গী হানার কথা তো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, লোককথা এবং ছড়াতেও তা স্থান পেয়েছে। "ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো, বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কীসে"? সেই বর্গী হানা পঞ্চকোট রাজ্যেও হয়েছিল। জনৈক সরাক ব্যক্তি সেই সময় যে শিশুকে বর্গীর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং পঞ্চকোট রাজ বংশের জীবিত উত্তরসূরি মণিলাল সিংদেও। কিন্তু এটুকু বললেই শেষ হলো না, বরং বলা যায়, কাহিনি শুরু করা গেল। তাই, কারা এই বর্গী? কেন তাদের এই আক্রমণ? সেসব বিষয় সম্পূর্ণ জানা দরকার। সরাক জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বর্গী আক্রমণের যোগ আছে, সেকথা কোথাও লেখা নেই। সেই অনুক্ত ইতিহাসের প্রয়োজনেই বর্গীদের উল্লেখ করার প্রয়োজন। তাই বর্গীদের কথাই আগে লিখি। "এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি" স্বপ্ন নিয়ে যে মারাঠা বীর মুঘলদের সাথে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, সেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত পূর্ণ না হলেও মধ্য ভারতে এক বিরাট মারাঠা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন তিনি। পরবর্তীতে নাগপুর রাজ্যের মারাঠা রাজা হন রঘুজী ভোঁসলে। 'হিন্দু পাদ পাদশাহী'র স্বপ্ন তখনও

মারাঠাদের হৃদয় থেকে লুপ্ত হয় নি। ফলে আনুগত্য ও রাজস্ব আদায়ের জন্য মারাঠারা বারংবার বিভিন্ন রাজ্যে হামলা করতে থাকে। সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য তাদের যে পরিমাণ ধন-দৌলত প্রয়োজন ছিল তা একমাত্র একাধিক রাজ কোষাগার লুণ্ঠন করেই পাওয়া সম্ভব ছিল। সব মিলিয়ে রাজপরিবারগুলোই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। সেই সময় বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন আলিবর্দি খাঁ। ১৭৪০ সালে সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে তিনি সিংহাসনে বসেন। আলিবর্দিকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন ওড়িশার নায়েব-নাজিম তথা সরফরাজের শ্যালক রুস্তম জং। আলিবর্দি তাঁকে ওড়িশা থেকে বিতাড়িত করলে তিনি নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের দ্বারস্থ হন। রঘুজির সাহায্যে রুস্তম আবার ওড়িশার অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দি ফের তাকে উৎখাত করেন। এরই মধ্যে রঘুজী এক অশ্বারোহী সৈন্যদল বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরাই বর্গী নামে ইতিহাসে উল্লিখিত। তারা পাঞ্চেত হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে ভয়ানক লুঠপাঠ চালায়। প্রায় দশ বছর ধরে পাঁচ বার আক্রমণের মাধ্যমে এই লুঠতরাজ চলে। বাংলায় প্রবেশ করার সময় বর্গিরা গড় পঞ্চকোটে হামলা চালিয়েছিল। রক্ষীদের পরাজিত করার পর তারা প্রাসাদে ব্যাপক লুঠপাট চালায়। স্থানীয় লোকেরা বলে থাকেন, বর্গী আক্রমণের সময়ে তখনকার রাজার ১৭ জন রানী একটি কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বর্গীরা রাজবংশের কাউকেই জীবিত রাখতে চায় নি।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ধনসম্পত্তি লুঠ করাই যাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাঁরা রাজপরিবারের সবাইকে হত্যা করতে চাইবে কেন? আসলে সেই কালে অনেকেই তাঁদের সোনাদানা, ধনদৌলত গুপ্তভাবে সঞ্চিত রাখতেন। সেইসব সঞ্চিত গুপ্তধন পাওয়ার জন্যই লুঠেরা-বাহিনী পরিবারের লোকেদের উপর অত্যাচার করত; এমনকি তাদের হত্যা পর্যন্ত করতেও পিছপা হত না। আবালবৃদ্ধ কাউকেই তাঁরা রেহাই দিত না। এক্ষেত্রে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা পরিবারের অন্যদের অনুরোধ করত, "আমাদের মরে যেতে দাও, তবু দরজা খোলো না'। পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাঁরা এই অবস্থায় নীতিশাস্ত্রের আপ্তবাক্যের শরণ নিত, "সশস্ত্র ও সংখ্যায় অধিক শত্রু পরিবেষ্টিত থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করা পুরুষকেও বীর পুরুষ বলা হয়"। এক্ষেত্রে সেই সুযোগ হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, বাড়ির মহিলাদের উপর এবং ধনসম্পত্তি যাদের জন্য অর্জন করা, পরিবারের সেই ভাবী প্রজন্ম ছোট ছোট শিশুদের উপর অত্যাচার করে এবং তাঁদের

হত্যার ভয় দেখিয়ে লুঠেরারা ধন সম্পত্তি লুট করার কৌশল অবলম্বন করে। লুটেরাদের নিয়মনীতির মূলকথা হলো লুঠ করা। সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলেই তারা চলে যায়। তারা ধন সংগ্রহের জন্যই আসে আর ফিরে যায়; সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আসে না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতবর্ষে লুটেরাদের বহু ইতিহাস আছে; যেমন গ্রীক, আরব, মোঙ্গল, শক, হুন, তুর্কী, ইংরেজ, প্রভৃতি। সুলতান মামুদ আর চেঙ্গিস খাঁ'র ভারত লুণ্ঠনের স্মৃতি তো আজও ভয়াল ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। তারা অনেকেই লুঠের মাল নিয়ে ফিরে গেলেও অনেকেই কিন্তু থেকে গেছে চিরস্থায়ীভাবে লুঠ করার জন্য। সেই সমস্ত হামলার ক্ষেত্রেও তারা হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার, নারী নির্যাতন, সবকিছুই করেছে; তবে সেটা দীর্ঘদিন ধরে ।

বর্গীদের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু অন্যরকম। উপরোক্ত লুটেরারা আক্রমণ করেছে মূলতঃ বিধর্মীদের উপর; লুঠ করেছে বিধর্মীদের সম্পত্তি। অত্যাচারও করেছে তাদের উপরই। বর্গীরা কিন্তু সধর্মী-বিধর্মী বিভাজন করে নিয়ে লুট করেনি; তারা বিধর্মীদের উপরও হানা দিয়েছিল কিনা, তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, বিধর্মীদের সাথে এই নিবন্ধের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। যেহেতু উদ্দেশ্যে আমার সরাকদের ইতিহাস সম্পর্কে লেখার, তাও আবার দুই থেকে তিন শত বৎসর পিছন থেকে, তাই শিখরভূমে বর্গী হামলার প্রসঙ্গই এখানে মুখ্য। বর্গীদের দ্বারা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় কী পরিমাণ লুঠ হয়েছিল, তা আপনারা ইতিহাসের পাতা উল্টোলেই বুঝতে পারবেন। তাই তার ফিরিস্তি দেওয়ার প্রয়োজন খুব একটা এখানে আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু যে বর্গীদের দ্বারা এই লুণ্ঠন কার্য চালানো হয়েছিল, তাদের কথা ও তাদের পরিচালকের কথা তো লিখতেই হবে। কারণ, এর সাথে সরাকদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। লুটেরাদের ইতিহাস তো লেখা আছেই ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু যেহেতু সরাকদের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখছি, তাই বর্গীদের সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। বর্গীরা মূলতঃ মধ্য-দক্ষিণ ভারতের লোক। লুণ্ঠন করা হয়তো বা তাদের পেশা ছিল না; অন্ততঃ তাদের সর্দারের তো ছিল না বলেই আমার মনে হয়েছে। তবে তাঁর দলের বাকি লোকেদের কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, তারা সুদূর মধ্য দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজপরিবারের ধনাগারগুলি নিশানা কেন করেছিল। সেই সময় মধ্যভারতের দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ

এলাকায় বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নাগপুরের মারাঠা রাজা রঘুজি ভোঁসলে মন্ত্রী পরিষদের প্রধান, রাজপুরোহিত, ধর্মগুরু, প্রমুখ সমাজের বিশিষ্টজনদের একটি সভা করেন । সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ থেকে শুরু করে কুচবিহার পর্যন্ত রাজাদের রাজকোষ লুণ্ঠন করে এনে এদেশের দুর্ভিক্ষ থেকে রাজ্যের মানুষকে বাঁচাবার ও রাজপরিবারের প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না; উপযুক্ত বাহিনী ও তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সেনাপতি সর্দার প্রয়োজন, যিনি ভৌগোলিক, সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পরিবেশকে অনুকূলে নিয়ে আসতে পারেন। সেই সঙ্গে লুঠের মাল সুরক্ষিত ভাবে স্বদেশে নিয়ে আসতে পারবেন। অর্থাৎ, এককথায় সর্বগুণসম্পন্ন হওয়া চাই। সেই ব্যক্তি আর কেউ হতে পারেন না ভাস্কর রাম কোলহাটকর পণ্ডিত ছাড়া। ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন মহারাজা রঘুজী ভোঁসলের প্রধানমন্ত্রী। পণ্ডিত ও রণকুশলী এই ব্যক্তির হাতেই লুণ্ঠনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রামে বা নগরে লুণ্ঠন কার্য চালানোর আগে সেই এলাকায় দু-চার বার রেইকি বা তদারকি করা হয়; অত্যন্ত গোপনে ও ছদ্মবেশে। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা, বের হওয়ার রাস্তা, তার ধনাগার কোথায়, কোন জায়গায় আঘাত করলে বাড়ির মালিক বা কর্তাকে সহজেই জব্দ করা যাবে, ইত্যাদি তথ্য এই সময় সংগ্রহ করা হয়। এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে কারা গৃহকর্তার মিত্রপক্ষ, কারা শত্রুপক্ষ, কারা লুটের কাজে সহযোগিতা করতে পারে ও কী কী শর্তে , গুপ্তচররা সে সব তথ্য জোগাড় করে নেয়। সেই কাজটি কিন্তু ভাস্কর পন্ডিত অন্ততঃ পক্ষে দু'বার করে গেছেন। অতি গোপন রাখার শর্তে তিনি যাদেরকে পাশে পেয়েছিলেন, তারা সম্ভবত রাজবাড়ির অনাদৃত ব্যক্তি, যারা নিজেদেরকে রাজপরিবার দ্বারা অবহেলিত মনে করতেন। যেমন পরিবারের বড় ছেলে রাজা হবে, রাজপুরোহিতের বড় ছেলে রাজপুরোহিত হবে, এ'রকমই নিয়ম ছিল। আবার পাটরানীরও ইচ্ছা থাকে যে তাঁর ছেলে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। পুরোহিতের অন্যান্য স্ত্রীদেরও নিজের ছেলেদের পিতার পদে আসীন করানোরর আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেনাপতির বাসনা থাকে নিজের সন্তানের জন্য একটা রাজপুরুষের পদপ্রাপ্তির। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজকর্মচারী আরো উচ্চপদের জন্য লালায়িত থাকে এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য মনে মনে ফন্দি খুঁজতে থাকে। এই সব মানুষেরা ভাস্কর পণ্ডিতকে সহযোগিতা করেছিল। তবে লুটের মাল ভাগাভাগির কোনো শর্ত তাদের ছিল না।

তিনি অর্থাৎ ভাস্কর পন্ডিত তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, লুট করা মাল ছাড়া রাজ- সিংহাসন, কোন পদ, এমনকি এদেশে থাকার বাসনাও আমার নেই। এমন কি আমার সঙ্গীসাথীরাও কেউ এ দেশে থাকবে না। তোমাদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে সেই মতো রাজা হওয়ার চুক্তি, সেনাপতি হওয়ার চুক্তি ইত্যাদি সব পেয়ে যাবে।

রাজা ছাড়া রাজ্য থাকতে পারে না। তখনও তেমনি ছিল মোটামুটি নিয়মকানুনগুলো। তখনকার প্রজারা অধিকাংশই ছিলেন জ্ঞানী, তবে নিরক্ষর; লোকশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে, যারা স্থানীয় ক্ষমতালোভী, যারা বর্গীদের মদত করেছিল তারা ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে শর্ত রেখেছিলো যে, রাজপরিবারের কোন উত্তরাধিকারীকে জীবিত রাখা চলবে না; তা সে একদিন বয়সী হোক বা একশত বছরের। এমত অবস্থায় লড়াই চলাকালীন রাজ পরিবারের সদস্যরা জেনে যায় যে তাদের পরিবারের কোনো সদস্যকেই হামলাকারীরা জীবিত রাখবে না। যারা এতদিন রাজপরিবারের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছে, যাদেরকে পরিবারের সকলে বিশ্বাস ও ভরসা করেছে, তারাই এখন পরিবারের সদস্যদের এক এক করে চিনিয়ে দিয়ে হত্যা করতে সাহায্য করেছে। ঠিক তখনই এক সরাক রাজকর্মচারীর কথা তাঁদের মনে আসে। এখানে চাকরিতে ঢোকার আগে মানবাজার রাজ্যে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল এই মানুষটির। সেই সূত্রে আগেও বিভিন্ন প্রয়োজনে পঞ্চকোট রাজদরবারে যাতায়াতও ছিল তাঁর। তার মিত্রসুলভ ব্যবহারের জন্য রাজ পরিবারের সকল সদস্যেরই তিনি মোটামুটি প্রিয় ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ও আনুগত্যের প্রতি কারো কোনও রকম সন্দেহ ছিল না। ফলস্বরূপ, রাজপ্রসাদের অন্দরমহলেও তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল, রাজপরিবারের মহিলারাও তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন; এমনকি একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজের জন্য নির্দ্বিধায় তাঁর উপরই দায়িত্ব দিতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করবো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবাজার রাজ এস্টেটে তিনি কাজ করেছেন অর্থাৎ রাজকর্মচারী ছিলেন। আমার মনে হয় সরাকদের মানবাজার থেকে পঞ্চকোটে অভিবাসনের আগেই তিনি পঞ্চকোটে রাজ কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রয়াসেই মানবাজার সংকটের সময় সরাকরা তাঁর মাধ্যমে পঞ্চকোট রাজের সাথে যোগাযোগ করে সেখানে তাঁদের বসবাসের অনুমতি জোগাড় করতে এবং তাঁদের সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তার একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি

আদায় করতে পেরেছিলেন। এখানে একটা বিষয় ভাবা যায় যে, একটি ঘটনায় মানুষ যখন নিজের বাসস্থান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বা তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় তখন দু-পাঁচটি পরিবার কোনদিকে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন স্থানের দিকে গেলে নিজেদেরকে সুরক্ষিত ঠিকানায় নিয়ে যেতে পারবে, সে বিষয়ে অতি অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়তো সম্ভব; কিন্তু একটি সমগ্র সম্প্রদায়ের বা জাতির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। তাই একরাতের মধ্যেই মানবাজার ত্যাগ করে পঞ্চকোটে চলে আসার কিংবদন্তীর সত্যতা নিরূপণের অবকাশ রয়েই যায়। । মানবাজারকে শুধুমাত্র একটা সিম্বলিক নাম দিয়ে বলা হয়; তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সরাকরা সকলেই সকলেই মানবাজার নগরেই বসবাস করতেন। মানবাজার এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জেও তাঁদের বসবাস ছিল। তাই সহজেই অনুমেয় যে, তারা শুধুমাত্র রাজার দিক থেকে বিপদের আশঙ্কায়ই ছিলেন না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আক্রমণের শিকারও হয়তো হয়েছিলেন। যদি শুধু রাজরোষ হত, তাহলে কিন্তু সকলকে সংগঠিত করে একসঙ্গে পালিয়ে আসতে পারতেন না, বা পরিকল্পনা করে একটা বিশেষ তারিখে রাত্রিবেলা নিজের বাসভূমির উত্তর দিকে অর্থাৎ পঞ্চকোট রাজাদের শাসন এলাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়ে কালিকাপুরে (বর্তমানে স্থানটির নাম দাপুনিয়া) জড়ো হতে পারতেন না। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই কালিকাপুরেই সকলকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে সবাই জড়ো হওয়ার পর এখান থেকেই শিখরভূমের বিভিন্ন মৌজায় বসতি স্থাপনের নির্দেশ তাঁরা পেয়েছিলেন পঞ্চকোটের রাজার কাছ থেকে। এই বিশাল মাঠে তখন না ছিল পাকা সড়ক, না ছিল রেললাইন। ডহর অর্থাৎ গরুর গাড়ির ও পায়ে চলার পথ অবশ্য ছিল। সেই স্থান থেকেই পঞ্চকোট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে অভিবাসিত করা হয়। বহু সরাক অবশ্য পরবর্তীকালে এসব জায়গা থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র অভিবাসী হয়। কিন্তু সেটা অন্য বিষয়। এ সম্বন্ধে পরবর্তী লেখায় আলোচনার চেষ্টা করব।

গৌরচন্দ্রিকা অনেক হলো; চলুন এইবার লুটপাটের দিকে আরেকবার যাওয়া যাক। না না, ঘাবড়াবেন না, আপনাদের লুটেরার দলে ভেড়াবো না। হালকা ছলে বলতে গেলে আপনাদের সেই মুরোদ নেই। আপনাদের পরম্পরা লুণ্ঠিত হওয়ার পরম্পরা, অত্যাচারিত হওয়ার পরম্পরা। লুটেরার দলে ভিড়বার সংস্কার সরাকদের কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। তারা চিরদিনই

পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সততার উপর নির্ভর করেছে বেশি। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য ইদানীং কখনও কোন সময় কোন কোন ক্ষেত্রে একটু আধটু হয়তো করে করতে বাধ্য হচ্ছে। পরবর্তীকালে এই সম্পর্কে বলবো, যদি সময় ও সুযোগ পাই। কিন্তু এখন আর সময় নেই, কারণ বর্গীরা রাজপরিবারের অস্ত্রাগার, ধনাগার দখল করে অন্দরমহলে দিকে অগ্রসর হয়েছে। রাজপরিবারের পুরুষদের প্রায় সবাই নিহত হয়েছেন। পুরনারীগণ সকলেই জহরব্রত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। জহরব্রত সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই; যতটুকু আছে, তা কেবল বইয়ের পাতায় পড়ে ও রাজপরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শুনে। তাঁরা এখনও এই দুনিয়ায় সশরীরে আছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে একটু বলি। জহরব্রত সম্বন্ধে আমি যতটুকু শুনেছি এই ব্রতের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় রাজাদের রানীরা বা রাজপরিবারের বিবাহিত মহিলারা (সন্তান থাকলে তাকেও কোলে নিয়ে) আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করতেন। কুমারী কন্যারাও প্রাণ ত্যাগ করতেন, তবে আগুনে নয় জল সমাধি নিয়ে। কিন্তু জলাশয় যত বড় ও গভীরই হোক না কেন, শেষ মুহূর্তে মানুষের বাঁচার অদম্য ইচ্ছার কারণে খোলা জলাশয়ে মৃত্যুবরণ করা কঠিন, বরং আক্রমণকারীদের হাতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দস্যুরা যাতে জীবিত অবস্থায় তাদের উদ্ধার না করতে পারে, সেই জন্য তাঁরা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালের জনশ্রুতিতে। রানীমহলের কূপ থেকে নাকি প্রচুর অলংকার বহু লোক পেয়েছিল, এমনই জনশ্রুতি আছে। আগেই বলেছি যে, সরাক সমাজের কোনো কোনো ব্যক্তি পঞ্চকোট রাজার অধীনে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে প্রবীণ, এবং যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর হাতেই মহারানী স্বীয় পুত্রকে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমর্পণ করে নিজে প্রাণত্যাগ করেন। সেই রাজকুমারেরই নাম মণিলাল সিং দেও, যিনি পরবর্তীকালে রাজ সিংহাসনে বসে প্রথমেই তাঁর রক্ষাকর্তা সেই সরাক মানুষটির কাছে জানতে চান যে, আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি, যা আপনাদের উপকারে লাগবে। আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, শুধু তাই নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে আমাকে পালক পিতামাতার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তাছাড়া যে গ্রামের মানুষ আমাকে লুকিয়ে রেখে দীর্ঘদিন আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমার রাজমুকুট পরানোর স্বপ্ন দেখেছেন, আমি তাদের জন্য যদি

কিছু না করতে পারি তাহলে সারা জীবন একটা অন্যায় পাপবোধ আমাকে তাড়া করে বেড়াবে। তাতে আমার ও আমার রাজ্যবাসীর কোনরূপ মঙ্গল হবে না।

তার আগে কয়েকটা বিষয় আপনাদের অবগত করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করি। যে ব্যক্তির হাতে রাজপুত্রকে দিয়ে মহারানী প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি সরাক জাতির সেই কর্মচারী, যার কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি শুধু রাজকর্মচারী ছিলেন এটা তার একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি রাজপরিবারের এতটাই বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁকে পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত কাজের বিষয়েও রাজা ভরসা করতেন। পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন মহারাজা। তাই তাঁর অধীনস্থ বহু করদ রাজা ও জমিদার ছিলেন, যেমন মানবাজার, ঝরিয়া, ডোমরা ইত্যাদি এলাকার রাজারা। তেমনি যাঁরা দশঘরিয়া রাজা, তাঁদের সাথে এঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল, যার ফলস্বরূপ সেই সমস্ত রাজপরিবারের রাজাদের কারও শ্বশুরবাড়ী, কারও মামাবাড়ী বা রাণীদেরও বাপের বাড়ি ইত্যাদি সম্পর্কসূত্রে গাঁথা ছিল এই পরিবার। রাজস্ব, তহবিল পাঠানো, কর আদায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক কাজ, ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন করদ রাজ্যে যেমন এই ব্যক্তিটিকে যাতায়াত করতে হত, তেমনি সেই সঙ্গে অন্য ধরনের কাজেও তিনিই ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভরসার পাত্র। যেমন, রাজকুমারীরা নিজেদের ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীদের এবং রানীরা তাদের বাপের বাড়ির অন্যান্য কুটুম্বদের কাছে সমাচার, পরিতোষিক, উপঢৌকন ইত্যাদি নির্দ্বিধায় পাঠাতেন উক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে। এহেন ব্যক্তির হাতেই বংশের শেষ কুলপ্রদীপ কে সমর্পণ করে দিয়াছিলেন মহারানী।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সরাক পরিবারে আচরিত কিছু সামাজিক ও পারিবারিক আচারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আহারে তাঁরা নিরামিষাশী। বৈদিক সংস্কৃতির দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হলেও তারা বৈদিক ধর্মের মূল স্রোতের সাথে এখনও পর্যন্ত নিজেদেরকে মেলায় নি। যেমন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান করাতেন না। তবে একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় সরাকদের নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য নানা রকম সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সময় তাঁদের সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করে তাদের সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার নিরন্তন প্রয়াস জারি করে রাখে। যেমন নাপিত, কামার, কুমোর অর্থাৎ যারা সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তারা যেন সরাকদের বাড়ির কোনো কাজ না করে। এমনকি তাদের হাতের ছোঁয়া জল পর্যন্ত যেন না

খায়। এইরূপে তাঁদের চাপের মধ্যে রাখা হয়। এমনকি বহুবার ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সময় তাঁদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। এই ভয় সরাকদের মধ্যে ছিলই।

এমত অবস্থায় রাজকুমারকে বাড়িতে এনে রাখা বেশ সমস্যার বিষয় হয়। প্রথমতঃ সদ্য আত্মীয়বিয়োগ হওয়া বালক। দ্বিতীয়তঃ এখনো কথা বলার মত বয়স তাঁর হয় নি। তাকে খাওয়ানোও একটা সমস্যা। এদিকে বর্গীর সর্দারের কাছে স্থানীয় গুপ্তচররা খবর পাঠায় যে, রাজপরিবারের এক উত্তরাধিকারী এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু যেহেতু রাজপরিবারের কোন উত্তরাধিকারীকে জীবিত রেখে আপনাদের এখান থেকে যাওয়ার কথা নয়, এবং আমাদের কাছে খবর আছে যে, এক সরাক পরিবারে জীবিত অবস্থায় এক রাজপুত্রকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাই তাকেও শেষ করা আপনাদের দায়িত্ব। তখন ভাস্কর পণ্ডিত প্রশ্ন তোলেন যে, সেই বালকটি যে রাজকুমার তার প্রমাণ কী? তারা যুক্তি দেখায়, শিশুটির গায়ের রঙ পরিষ্কার, দুধে আলতার মত, রাজপুত্রদের মতই; অতএব, সে নিঃসন্দেহে রাজপুত্রই। ভাস্কর পন্ডিত শুধু এইটুকু প্রমাণের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। সেই সময় সরাকদেরও অধিকাংশেরই আর্যসুলভ চেহারা এবং গাত্রবর্ণ ছিল। কিন্তু যেহেতু রাজ পরিবারের সকল সদস্যকে শেষ করার অঙ্গীকার তিনি রাজদ্রোহীদের কাছে করেছিলেন, তাই তাঁকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হতে হয়। তা না হলে, যে বালক এখনো কথা বলতে পর্যন্ত শেখে নি, তাকে হত্যা করার প্রয়োজন বর্গীদের ছিল না। তাই ভালোভাবে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তিনি নিজের সৈন্যদের তাদের সাথে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিলেন যে, সেই বালকের উচ্ছিষ্ট যদি সরাকরা খায়, তাহলে তোমরা ফিরে আসবে; আর, যদি না খায় তাহলে তাকে হত্যা করে আসবে। ভাস্কর পন্ডিত ভালোভাবেই জানতেন যে, সরাকরা প্রাণ গেলেও কোনও মাংসাহারীর উচ্ছিষ্ট খাবে না; তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় এই খবরটি তিনি রাখতেন।। তাই তিনি লুটেরার সর্দার হলেও ইতিহাস তাঁকে ভাস্কর পন্ডিত বলেই উল্লেখ করেছে।

স্থানীয় গুপ্তচরেরা বর্গী সেনাদের সেই বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে বলে যে, যে বালকের কান্নার আওয়াজ কানে আসছে, সেই বালকই রাজকুমার। সেই সময় দুধের গ্লাস নিয়ে বাড়ির কোন পুরুষ সদস্য বালকের কান্না থামাতে ও কিছু খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গুপ্তচররা কোন সময়ই সশরীরে ঘটনার কাছে থাকে না, কারণ তারা পরিচিত ও চেনা

মুখ। তাই তারা যাতে পরবর্তীতেও ভাল মানুষ সেজে থাকতে পারে, ওদের যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে, তাই তারা সবসময় আড়ালেই থাকে। যথারীতি বর্গী সেনারা উক্ত গৃহে প্রবেশ করে গৃহকর্তাকে প্রশ্ন করে, "এই ছেলেটি কার সন্তান"? উত্তরে গৃহকর্তা জানান, "এ আমার পুত্র"। তারা প্রশ্ন করে, "ছেলের মা কোথায়"? যেহেতু বাড়ির মহিলাদের আগেই বর্গীদের হানা থেকে রক্ষা করতে অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই সে জবাব দিল, "আমার সাথে ঝগড়া করে ছেলেকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে"। এমত অবস্থায় কার চোখে জল না আসে ! তাই এত বড় হত্যালীলার সংঘটকদের চোখেও জল এসে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা বলল, "এই ছেলে যখন তোমার, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এর এঁটো খাবার খেতে পারবে"? সেই সরাক ব্যক্তি বুঝতে পারল, সর্বনাশ আসন্ন। আমিষভোজীর তো দূর, কোনও জাতিরই উচ্ছিষ্ট খাওয়া সরাক আচারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবু নুন খাওয়ার দাম তো তাকে দিতেই হবে। সামনে কঠিন পরীক্ষা। তাঁর উপরই নির্ভর করছে পঞ্চকোটের শিখর রাজবংশের অস্তিত্ব। অতএব, তিনি আচারবিচারের বিষয়টা উড়িয়ে দিয়ে উত্তর দিতে বাধ্য হলেন, "নিশ্চয়ই"। প্রত্যুত্তরে তাঁরা নির্দেশ দিল, "খাও"। তিনি বাক্যব্যয় না করে ছেলেটিকে খাওয়ার জন্য যে খাবার রাখা ছিল তার থেকে কিছু খাবার মুখে তুললেন। ধর্মীয় আচার, জাতি-আচার, কুলাচার, ইত্যাদি মানুষের কাছে অলঙ্ঘ্য। কিন্তু বৃহত্তর মহৎ উদ্দেশ্যে এই সরাক ব্যক্তি যা করলেন, তা মানবিকতার এক অমূল্য নিদর্শন হয়ে রইল। অগত্যা বর্গী সেনা ফিরে গেল। গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে খবর দিল যে, গৃহকর্তা ছেলেটির উচ্ছিষ্ট খেয়েছে।

কিন্তু যারা রাজগদি পাওয়ার আশা করে এত বড় ষড়যন্ত্রের সহযোগী হয়েছিল, তারা তীরে এসে তরী ডুবতে দেখে বিচলিত হয়। নতুন ফন্দি এঁটে তারা গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে বলে, ছেলেটির উচ্ছিষ্ট না হয়, সে খেয়েছে; কিন্তু ছেলেটিকে সে নিজের উচ্ছিষ্ট খাইয়েছে কি? এই ঘটনার কথা সরাকদের কানে এসে পৌঁছায়। এঁরা তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারেন। যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, বালকটি রাজকুমার, তাহলে বর্গীরা তাকে মেরে ফেলবে। আর যদি উল্টোটা হয়, তাহলে স্বার্থান্বেষীদের প্রচার করতে সুবিধা হবে যে, বালকটি আদৌ রাজপুত্র নয়, সে সরাকদের সন্তান; অর্থাৎ সরাকেরা নিজেদের বালককে সিংহাসনে বসানোর ফন্দি করছে। এই প্রচারও যদি সফল না হয়, প্রজারা যদি তাকে রাজকুমার বলেই মেনে নেয়, তখন আরও একটা প্রচার করা

হবে, যেহেতু অন্য জাতের হাতের ছোঁয়া জল খেলে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের জাত যায়, তাই এক্ষেত্রে সরাকরা রাজপুত্রের জাত মেরেছে। নিজের উচ্ছিষ্ট খাইয়েছে; অন্নপাপ, যার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। সুতরাং তাদের পঞ্চকোট রাজার রাজত্বে থাকার কোন অধিকার নেই। অতএব তাদের বিতাড়িত করো। এইভাবে প্রজাদের মধ্যে একটা জনারোষ সৃষ্টি করে একটা বিশৃংখলার মধ্যে রাজকুমার কে হত্যা করে তার দায়ভার সরাকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে যে, "সরাকরা কত হীন প্রকৃতির লোক ! যখন তারা দেখল, রাজসিংহাসন পাওয়ার কোন আশা নেই, তখন তারা রাজকুমারকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। আমরা বহু চেষ্টা করেও তাদের হাত থেকে রাজকুমার কে যখন বাঁচাতে পারলাম না। তাই প্রজাদের অভিভাবকহীন দেখে সকলের অনুরোধে নেহাৎই বাধ্য হয়ে অশ্রুসজল চোখে রাজ সিংহাসন এর মর্যাদা রক্ষার্থে সিংহাসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম"। যারা রাজকুমারের জীবন রক্ষার ও সরাকদের দেশ হতে তাড়াবার কাজে সহযোগিতা করবে, তাদের জন্য সরাকদের ছেড়ে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল নেওয়ার আদেশ দেবে, এই লোভ দেখিয়ে তাদের দলে টেনে কার্য সিদ্ধ করবে। যদিও সে অভিলাষ তাদের পূরণ হয় নি, শুধু সরাকদের চাতুর্যের জন্য। সেই সময় শারীরিক গঠনের ও গায়ের রংয়ে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও সরাকদের মধ্যে একটা সমতা ছিল। তাই তাঁকে অর্থাৎ রাজকুমারকে একটি রাজভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কাছে রেখে দিয়ে তাঁরা কয়েকটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। যখন বর্গী সৈন্যরা পুনরায় ফিরে এসে ঐ পরিবার এবং রাজকুমারের খোঁজ করে, তখন সেই পরিবারগুলিকে না পেয়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে অতি গোপনে সসম্মানে প্রতিপালিত হতে থাকেন রাজপুত্র। পরে অনুকুল পরিস্থিতি এলে রাজমুকুট মাথায় দিয়ে কপালে রাজটিকা নিয়ে তিনি রাজ সিংহাসন অলংকৃত করেন। যে গ্রামের ব্রাহ্মণরা রাজকুমারকে. নিরাপদে প্রতিপালিত করেছিলেন, সেই গ্রামের ব্রাহ্মণদের সম্মানে সেই রাজা অর্থাৎ মণিলাল সিং দেও গ্রামটির নূতন নামকরণ করেন 'মনিহারা' নামে; কেননা ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবার রাজকুমার মণিকে গোপনে আশ্রয় দেওয়ার কারণেই রাজকুমার মণি শত্রুপক্ষের নজর থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আবার একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে, রাজকুমার মণিলালকে চোখের মণির মত করে সেখানে আগলে রাখা হয়েছিল; সেই রাজকুমার বড় হয়ে রাজ সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চলে আসায় গ্রামটি প্রকৃত অর্থেই মণিহারা হয়ে গিয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজে সরাকদের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল, হয়তো বা সরাকদের জৈন সংস্কৃতি এবং আর্থিক সচ্ছলতা সমাজের অন্যান্য প্রভাবশালীদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, ইত্যাদি পেশার লোকেদের সরাকদের কোন পরিষেবা দিত না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পারিপার্শ্বিক বৈদিক তথা পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে স্থানীয় জৈনেতর সমাজের মতোই সরাক পরিবারেও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ধোপা-নাপিত-পুরোহিত বন্ধ থাকায় তাই সরাকদের খুবই সমস্যা হচ্ছিল।

মণিলাল সিং দেও সামন্ত রাজা-মহারাজা, জমিদার এবং পাত্রমিত্রদের উপস্থিতিতে যখন সিংহাসন গ্রহণ করলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথমেই ঘোষণা করলেন, "আমার পুরোহিত, কর্মকার, মালাকার, রজক, ইত্যাদি পেশার লোকেরা আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করে, আজ থেকে সরাকদের সাথেও সেই একই রকম ব্যবহার করবে। শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্র বাবু লিখেছেন "মোর পুরোহিত তোর পুরোহিত"। আর ব্রাহ্মণদের গ্রামের নাম রাখা হলো মনিহারা, যেহেতু তিনি এই গ্রামেই বাল্য থেকে রাজ্যভিষেক পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। মণিহারা গ্রামের জন্য তিনি মাত্র চার পয়সা খাজনা ধার্য করলেন ও সেখানকার ব্রাহ্মণদের রাজসভায় সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার অধিকার ঘোষণা করলেন। কথিত আছে, মনিহারা মৌজাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কর ঘোষণা করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মনিহারার ব্রাহ্মণরা অনুরোধ করেন যে, রাজসম্মান রক্ষার জন্য প্রতীকী হিসাবে সামান্য হলেও কিছু খাজনা ধার্য করা হোক। তাঁদের অনুরোধে তখন চার পয়সা মাত্র খাজনা ধার্য হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ ব্রাহ্মণরা অতিশয় চালাক ছিলেন, তাই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে খাজনার অনুরোধ করেছিলেন। এই বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, নিষ্কর মানে কুরফাসত্ত্ব, যার বিলিবন্টনের অধিকার থাকে না। কর ধার্য হলে সেই অধিকার পাওয়া যাবে। আবার অনেকে বলেন, প্রকৃতপক্ষেই রাজার সম্মানে খাজনার অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনা। অলমতি বিস্তরেণ।

(অনুলিখনঃ- শ্রী জয়প্রকাশ সিংহ)

প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা

শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাকৃত ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়েই প্রাকৃত সাহিত্য। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে যখন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ তৎকালের প্রচলিত সাধারণের কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন, তখন থেকেই প্রাকৃত সাহিত্যের আরম্ভ বলা যায়। আসলে অশোকের অনুশাসনাবলীতে এবং অশোকের পরবর্তী কালে তাম্রপট্টে ও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান বৌদ্ধদের পালিতে রচিত গ্রন্থে প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। এখানে পালি প্রাকৃত ভাষাই। জৈন আগম সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে (সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়ে), সেতুবন্ধ, গৌড়বহ, কুমারপাল চরিত, গাথা সপ্তশতী, প্রভৃতি কাব্যে প্রাকৃত সাহিত্যের যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রাকৃত সাহিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিযোগী রূপে বিরাজমান ছিল। এখানে প্রাকৃত সাহিত্যের একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

জৈন আগম সাহিত্য

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাই জৈনদের ধর্মগ্রন্থে। মহাবীর মুখনিঃসৃত মধুর বাণী তাঁর শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে এই জৈন ধর্ম সাহিত্যের উৎপত্তি। এই জৈন সাহিত্যকে সাধারণতঃ 'সিদ্ধান্ত' বা 'আগম' বলা হয়। এর রচনা কাল সম্ভবত: খৃষ্টীয় প্রথম শতক। কারো মতে তৎপূর্বে, কারো মতে তৎপরে।

জৈনরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত - শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। সেজন্য তাঁদের পরস্পরের ধর্মগ্রন্থ একটু ভিন্ন প্রকারের, যদিও মূলত: উৎপত্তিস্থল এক।

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থ 'দৃষ্টিবাদ" লুপ্ত; আর দিগম্বরেরা বলেন, 'দৃষ্টিবাদ" তাঁদের দ্বারা রক্ষিত। এবং এই দিগম্বর সম্প্রদায়গণ কর্তৃক রক্ষিত গ্রন্থই বর্তমানে 'দিগম্বর জৈনাগম' বলে বিখ্যাত। দিগম্বরদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (১) পরিকর্ম, (২) সূত্র, (৩) প্রথমানুযোগ, (৪) পূর্বগত এবং (৫) চূর্ণিকা। এদের মধ্যে 'পূর্বগত' বাদে অপর চারিটির বিষয় কিছু জানা যায় না।

'পূর্বগত' আবার চৌদ্দটি উপবিভাগে বিষয়ীকৃত। যথা -

(১) উৎপাত (২) অগ্রায়নীয়, (৩) বীর্যপ্রবাদ, (৪) অস্তিনাস্তিপ্রবাদ, (৫) জ্ঞানপ্রবাদ, (৬) সত্যপ্রবাদ, (৭) আত্মপ্রবাদ, (৮) কর্মপ্রবাদ, (৯) প্রত্যাখ্যান, (১০) বিদ্যানুবাদ (১১) কল্যাণপ্রবাদ, (১২) প্রাণবায়, (১৩) ক্রিয়া-বিশাল এবং (১৪) লোকবিন্দু সার। অধুনা উক্ত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত না হলেও তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে জানতে পারি।

ষট্খণ্ডাগম -পুষ্পদন্ত ভূতবলি প্রণীত 'ষট্খণ্ডাগম' একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন ধর্ম গ্রন্থ। এটি জৈন শৌরসেনী ভাষায় রচিত; মধ্যে মধ্যে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। এর রচনাকাল সম্ভবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি দর্শন বিষয়ক এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। এটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। যথা - জীবস্থান, ক্ষুল্লকবন্ধ, বন্ধস্বামিত্ব বিষয়, বেদনা, বর্গনা ও মহাবন্ধ। পুষ্পদন্ত প্রথম ১১টি সূত্র রচনা করেন এবং তৎপরে ভূতবলি অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। সর্বসাকুল্যে ৬০০০ সূত্র এতে দৃষ্ট হয়। বীরসেন কর্তৃক বিরচিত 'ধবলা" নাম্নী এর টীকা এরূপ প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থখানি 'ধবলা' নামেও বিখ্যাত।

কসায় পাহুড় (কষায় প্রাভৃত) - গুণধরাচার্য কর্তৃক বিরচিত 'কসায় পাহুড়' আর একটি দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। এর রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক। এই গ্রন্থে ক্রোধাদি কষায়ের রাগদ্বেষাদিরূপে পরিণতি, তাদের প্রকৃতি, অবস্থান, অনুভাগ, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'পেজ্জ দোস পাহুড়' (পেজ্জ = পেয়স, রাগ, দোষ = দ্বেষ এবং পাহুড় = প্রাভৃত)। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রন্থে ক্রোধাদি চারটি বা হাস্যাদি নয়টি রাগদ্বেষাদির কথা বলা হয়েছে বলে এই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'পেজ্জ দোস পাহুড়' । বীরসেনাচার্যকৃত এর টীকা গ্রন্থ 'জয় ধবলা' নামেও বিখ্যাত।

মহাবন্ধ - ষখণ্ডাগমকে যে ছয় ভাগ করা হয়, তার অন্তিম ভাগের নাম 'মহাবন্ধ'। এর আকার এরূপ বিশাল যে, কাল ক্রমে এটি ষটখণ্ডাগম হতে পৃথক হয়ে যায় এবং পৃথক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে থাকে। এই অংশের টীকাও পৃথক। টীকার নাম 'মহাধবলা"। ভূতবলি আচার্য এই গ্রন্থের প্রণেতা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি জৈন শৌরসেনী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের বন্ধন। কিসে জীব বন্ধনদোষ হতে মুক্তি পাবে এবং কত প্রকার বন্ধন আছে ইত্যাদি বিষয়ের এতে আলোচনা আছে।

তিলোয়পণ্ণত্তি (ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি) - বৃষভাচার্য কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত তিলোয়পণ্ণত্তি বা 'ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি" একটি প্রাচীন দিগম্বর গ্রন্থ। এতে ভূ-বিবরণ এবং বিশ্ব নির্মাণ কৌশল বিষয়ক বহু তথ্যমূলক তত্ত্ব আছে। প্রসঙ্গক্রমে এর মধ্যে জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী, কাল নিরূপণ এবং বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জম্বুদ্বীপ, ঘাতকীখণ্ডদ্বীপ, পুস্করদ্বীপ প্রভৃতি বহু দ্বীপের এবং জৈন কালচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায় জৈনশাস্ত্র ও তত্ত্ব উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হলে গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক। গ্রন্থখানি মহাধিকার দ্বারা বিভক্ত এবং অতিপ্রাচীন। কারণ, 'ধবল' নামক টীকায় এর উল্লেখ আছে।

দিগম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ বিশাল। কিন্তু এ যাবৎ খুব বেশী ছাপা হয় নি। অধুনা বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি এদিকে পড়ছে।

শ্বেতাম্বর জৈনরা কিন্তু পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে তাঁদের আগম গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং তার অন্তর্গত কোন গ্রন্থ বর্তমানে লভ্য নয়। সে যা হোক; দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর গ্রন্থনিচয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের ধর্মগ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়েছে। সুতরাং 'দৃষ্টিবাদ' বাদে শ্বেতাম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ ৪৫ খানি। নিম্নে এদের সংস্কৃত নাম দেওয়া হল।

(ক) **একাদশ অঙ্গ** - (১) আচারাঙ্গ সুত্র, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্র, (৩) স্থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়াঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী বা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, (৬) জ্ঞাতৃধর্মকথা, (৭) উপাসকদশা সুত্র, (৮) অন্তকৃৎদশা সূত্র, (৯) অন্যুত্তরোপপাতিকদশা সূত্র, (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি এবং (১১) বিপাকশ্রুত।

(খ) **দ্বাদশ উপাঙ্গ** - (১২) ঔপপাতিকদশা সূত্র, (১৩) রাজপ্রশ্নীয়, (১৪) জীবাভিগম, (১৫) প্রজ্ঞাপনা সূত্র, (১৬) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (১৭) জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, (১৮) চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি (১৯) নিরয়াবলী (২০) কল্পাবতংসিকা, (২১) পুষ্পিকা, (২২) পুষ্পচূলিকা এবং (২৩) বৃষ্ণিদশা।

(গ) **দশ প্রকীর্ণ** - (২৪) চতু:শরণম্, (২৫) আতুরপ্রত্যাখ্যানম্, (২৬) ভক্তপরিজ্ঞা, (২৭) সংস্তার, (২৮) তণ্ডুলবৈচালিক, (২৯) চন্দ্রবিদ্যা, (৩০) দেবেন্দ্রস্তব, (৩১) গণিতবিদ্যা, (৩২) মহাপ্রত্যাখ্যান এবং (৩৩) বীরস্তব।

(ঘ) **ষট্ ছেদসূত্র** - (৩৪) নিশীথ, (৩৫) মহানিশীথ, (৩৬) ব্যবহার, (৩৭) আচারদশা বা

দশাশ্রুতস্কন্ধ, (৩৮) বৃহৎকল্প এবং (৩৯) জিতকল্প বা পঞ্চকল্প।

(ঙ) **মূল সূত্র** - (৪০) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (৪১) আবশ্যক সূত্র, (৪২) দশবৈকালিক সূত্র (৪৩) পিণ্ডনির্যুক্তি।

(চ) **চূলিকা সূত্র** - (৪৪) নন্দী সূত্র, (৪৫) অনুযোগদ্বার।

এরপর আগম বহির্ভূত সাহিত্যের কথা বলছি।

(ক) **নির্যুক্তি**---জৈনগণ স্বীয় আগম গ্রন্থকে বোঝাবার জন্য সেই সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থই পরবর্তীকালে এক সাহিত্যে পরিণত হল। সেই জাতীয় সাহিত্যের নাম নিজ্জুত্তি (নির্যুক্তি)। বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেরূপ নিরুক্তের উৎপত্তি, সেরূপ জৈনাগম সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আগম গ্রন্থের রচনাকালে বা কিছু পরেই এই নির্যুক্তি গ্রন্থের আবির্ভাব। কারণ, আগম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় দুটি নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি - পিণ্ডনির্যুক্তি ও ওঘনির্যুক্তি। বর্তমানে নিম্নলিখিত আগমের নির্যুক্তি দৃষ্ট হয়; (১) আচারাঙ্গ সূত্রের, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের, (৩) সূর্য প্রজ্ঞপ্তির, (৪) উত্তরাধ্যয়নের, (৫) আবশ্যক সূত্রের, (৬) দশ বৈকালিকের, (৭) দশাশ্রুত স্কন্ধের, (৮) ব্যবহার সূত্রের, (৯) ঋষিভাষিত সূত্রের।

ভদ্রবাহুকে এই জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা বলে ধরা হয়। নির্যুক্তি সমূহ আর্যা ছন্দে জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত। আচার্যগণ এই জাতীয় নির্যুক্তি কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে এই নির্যুক্তিই বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়ে চূর্ণী ও ভাশ্য গ্রন্থে পরিণত হয় ও নতুন সাহিত্যের আকার ধারণ করে। আবার তা থেকে টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণি, ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। শ্বেতাম্বর জৈনাগম গ্রন্থেরই কেবল নির্যুক্তি দৃষ্ট হয়।

(খ) **চূর্ণি** - যেমন শ্বেতাম্বরদের নির্যুক্তি, তেমনি দিগম্বরদের চূর্ণিসূত্র। দিগম্বরেরা তাঁদের আগম গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই চূর্ণির উৎপত্তি করলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। নির্যুক্তি হল একটি কঠিন বা পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, আর চূর্ণি হল শব্দের এবং সূত্রের ব্যাখ্যা। নির্যুক্তি সাধারণত: পদ্যাত্মক, আর চূর্ণি গদ্যাত্মক। চূর্ণি-সূত্রকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ভাষ্য, টীকা প্রভুতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত চূর্ণি দৃষ্ট হয় : (১) গুণধর

প্রণীত কষায়পাহুড় চূর্ণি, (২) শিববর্মার কম্মপয়ড়ী চূর্ণি (কর্মপ্রকৃতি), (৩) শিববর্মার সতক (চূর্ণি বা বন্ধশতক চূর্ণি), (৪) সিত্তরী চূর্ণি (সপ্ততিকা চূর্ণি)। ইহা ছাড়া লঘুশতক চূর্ণি এবং বৃহচ্ছতক চূর্ণিও আছে।

(গ) **পট্টাবলী**---পট্টাবলী বা থেরাবলী (স্থবিরাবলী) বংশ পরিচয়াত্মক সাহিত্য। অর্থাৎ জৈন ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত আচার্য ও তৎশিষ্যগণের নামোল্লেখ আছে, তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় এই পট্টাবলী বা থেরাবলী সাহিত্যে। এ সাহিত্যে প্রভূত গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে--- (১) কল্পসূত্ত থেরাবলী, (২) নন্দীসূত্র পট্টাবলী, (৩) দুসমাকাল-সমন-সঙ্ঘথয়ং, (৪) তপগচ্ছ পট্টাবলী, ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

প্রাকৃত রামায়ণ

যতদূর জানা যায়, প্রাকৃত কাব্য জগতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বিমল সূরি কৃত পউমচরিয়ম (পদ্মচরিত)। গ্রন্থখানি জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় আর্যা ছন্দে রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লিখিত। লেখকের মতানুসারে গ্রন্থের রচনাকাল মহাবীরের নির্বাণ** অর্থাৎ রামচন্দ্রের জীবন চরিত বর্ণনা করেছেন। লেখক বহু ব্যাপারেই বাল্মীকিকে অনুসরণকরেন নি এবং সমস্ত ঘটনার মধ্যে জৈন ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি পাঠে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়।

প্রাকৃত মহাভারত

প্রাকৃত ভাষার আর একটী মহাকাব্য হচ্ছে ধবল কবি কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত মহাভারত হরিবংশ পুরাণ। গ্রন্থের রচনাকাল লেখকের মতে দশম বা একাদশ শতক। মহাভারতের কাহিনী সর্বাংশে অনুসৃত না হলেও লেখক এতে কৃষ্ণ ও বলরামের এবং কুরু ও পাণ্ডবদের ঘটনানিচয় সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন এবং সকলকেই, হয় জৈনধর্মে দীক্ষিত না হয় জৈন ভাবাপন্ন করে তুলেছেন।

প্রাকৃত পুরাণ বা চরিত

যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা অনুসরণে প্রাকৃত রামায়ণ ও মহাভারত লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি, পুরাণের পন্থা অনুসরণে প্রাকৃত পুরাণ রচিত হল। অর্থাৎ জৈন মহাপুরুষ বা তীর্থংকরদের জীবনী অবলক্ষণে এই প্রাকৃত পুরাণের সৃষ্টি হল। দিগম্বররা এই জাতীয় গ্রন্থকে

'পুরাণ" ও শ্বেতাম্বররা 'চরিত" আখ্যা দেন। এই প্রাকৃত পুরাণের রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। ত্রিষষ্টিলক্ষণমহাপুরাণ, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত তীর্থংকর মহাপুরুষদের জীবন অবলম্বনে পরবর্তীকালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে গুণচন্দ্র গণির (১) মহাবীর চরিয়ম (১০৮২ খৃ:), হরিভদ্রের (২) নেমিনাহ চরিউ (অপভ্রংশ, ১১৫৯ খৃ:), মাণিকচন্দ্র ও সকলকীর্তির শান্তিনাথ চরিত, সোমপ্রভাচার্যের (৪) সুমতিনাহ চরিউ প্রাকৃত পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুষ্পদন্তের মহাপুরাণ (১০ম শতক) একখানি উৎকৃষ্ট দিগম্বর জৈন পুরাণ গ্রন্থ।

প্রাকৃত কাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যের মত 'প্রাকৃত কাব্য'ও ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-অলঙ্কারে ও ঘটনার পারিপাট্যে মহীয়ান্। ভাষার নিমিত্ত প্রবেশ সহজ সাধ্য নয় বলে সাধারণ পাঠক এর থেকে রস গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু যদি একবার ভাষা আয়ত্তীকৃত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সংস্কৃত কাব্য থেকে এ কোন অংশে কম নহে। সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ আছে, সে সমস্ত পুংখানুপুংখ্য ভাবে হয়ত এতে সব সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু এ কাব্য নতুন ভাবে ভাবিত হয়ে এক নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। সংস্কৃত মহাকাব্যের ন্যায় কোনও এক গ্রন্থ থেকে এর ঘটনাসমূহ সচরাচর নেওয়া হয় নি, বরং অনেক কল্পনা শক্তি এ প্রাকৃত কাব্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূলকথা এই যে, প্রাকৃত কাব্যপাঠে যথার্থ আনন্দ পেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

এ ভাষায়, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, ধর্মকথাকাব্য, কথানককাব্য, গদ্যকাব্য চম্পূকাব্য, ইত্যাদি বহুজাতীয় কাব্য আছে। তন্মধ্যে কয়েকটীর নামোল্লেখ করা যাচ্ছে।

মহাকাব্য---প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, হেমচন্দ্রের কুমারপাল চরিত, সর্বসেনের হরিবিজয়, হরিভদ্রের সনৎকুমার চরিয়ম, ধনেশ্বরের সুর-সুন্দরী চরিয়ম, জোইন্দুর পরমপ্পয়াস, পুষ্পদন্তের নায়কুমার চরিউ, কনকামরের করকণ্ড চরিউ, হরিভদ্র সুরীর দুর্তাখ্যান, রামপানিবাদের কংসবহো, উসানিরুদ্ধম্, কুতুহলের লীলাবতী, ইত্যাদি।

খণ্ডকাব্য - হালের গাথা সপ্তশতী, জয়বল্লভের বজ্জালগ্গ গং, ইত্যাদি।

কোষকাব্য - আনন্দবর্দ্ধনের বিষয়-বানলীলা ইত্যাদি ।

ঐতিহাসিক কাব্য - বাকপতিরাজের গউভোবহো ও মহুমবিজয়, ইত্যাদি।

ধর্মকথাকাব্য---পাদলিপ্তাচার্যের তরঙ্গবতীর ছায়াবলম্বনে লিখিত তরঙ্গ লোলা, ধনপালের ভবিস্সয়ও কহা, হরিভদ্রের সমরাইচ্চকহা, মলয়সুন্দরী কথা, ইত্যাদি।

কথানককাব্য - কালকাচার্য কথানক, কথাকোষ কথামহোদধি, কথারত্নাকর, ইত্যাদি।

গদ্যকাব্য - সোমপ্রভাচার্যের কুমারপাল প্রতিবোধ, ধনপালের ভবিস্সয়ও কথা, ইত্যাদি।

চম্পূকান্ত - যসোহররিয় চম্পু, উদ্যোদনের কুবলয়মালা চম্পু, ইত্যাদি প্রধান।

প্রাকৃত নাটক

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই বিদ্যমান। স্ত্রীলোক বাদে উচ্চশ্রেণীর পাত্রগণ সংস্কৃত বলেন, আর স্ত্রীলোক সহ নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীগণ প্রাকৃত বলেন। কিন্তু প্রাকৃত নাটক তাদৃশ নহে। প্রাকৃত নাটকে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। এই জাতীয় নাটককে সট্টক বলে। এই নাটকে চারিটি অঙ্ক থাকে এবং তাঁর নাম জবনিকাস্বর। বর্তমানে আমরা ছয়টী প্রাকৃত নাটকের খোঁজ পাই। যথা : (১) রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, (২) নয়চন্দ্রের রত্নামঞ্জরী, (৩) রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা সট্টক, (৪) মার্কণ্ডের বিলাসবতী, (৫) বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমঞ্জরী এবং (৬) ঘনশ্যামের আনন্দসুন্দরী।

প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

কেবল প্রাকৃত কাব্যাদি রচনা করে প্রাকৃত সাহিত্য ক্ষান্ত হয়নি, বরং সংস্কৃতের ন্যায়, বিজ্ঞানমূলক রচনাপদ্ধতির দ্বারা একপ্রকার প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে। এ রচনার দ্বারা প্রাকৃত সাহিত্য পুষ্ট হয়েছে।

প্রাকৃত কোষ বা অভিধান

সংস্কৃত সাহিত্যে কোষ বা অভিধান গ্রন্থ প্রচুর। প্রাকৃতে আমরা কেবল দুইটি কোষ গ্রন্থের পরিচয় পাই---একটি ধনপালের পাইয়লচ্ছিনায়মালা আর একটি হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা। এদুটি গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিন্তু এছাড়া আরও প্রাকৃত অভিধান ছিল বলে অনুমান করতে পারি। কারণ, হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার টীকায় অনেক প্রাকৃত অভিধানকারীর নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ

ব্যাকরণ রচনায় প্রাকৃত সাহিত্যের একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়েছে। যদিও এঁরা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখতে বসেছেন, তথাপি তাঁরা সংস্কৃত ভাষার অবলম্বন করেছেন। কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ যেরূপ পালি ভাষায় রচিত, এ প্রাকৃত ব্যাকরণ তাদৃশ নহে। সূত্র রচনায় এঁরা সংস্কৃতের পন্থাই অনুসরণ করেছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে : (১) বররুচির প্রাকৃত প্রকাশ, (২) চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণ, (৩) হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৪) ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৫) ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, (৬) লক্ষ্মীধরের ষড় ভাষাচন্দ্রিকা, (৭) সিংহরাজের প্রাকৃত রূপাবতার, (৮) মার্কণ্ডেয়র প্রাকৃত সর্বস্ব, (৯) শ্রুতসাগরের ঔদার্য চিন্তামণি, (১০) রামশর্মা তর্কবাগীশের প্রাকৃত কল্পতরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ, প্রাচ্যা, আবন্তী, চাণ্ডালী, শাবরী, টাক্কী, নাগর, বাচড় প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্র

প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ প্রভূত রচিত না হলেও এর ছন্দোরাশি বিশাল। বিশেষ করে নব্যভারতীয় ছন্দের উৎপত্তির ব্যাপারে এর দান অনেক। পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত পিঙ্গল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একখানি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। এতে মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত উভয় জাতীয় ছন্দই বিদ্যমান। গাহা, বিগ্‌গাহা, রোলা, দোহা, ঘত্তা, কব্বলক্খণ মল্লিকা, চচ্চরী প্রভৃতি ছন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ছন্দানুশাসনম্ আর একটি বিশাল প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। কবিদর্পণও প্রাকৃত ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট ছন্দোগ্রন্থ।

প্রাকৃত ভাষায় দর্শন

জনগণ প্রাকৃত ভাষায় স্বীয় ধর্মের দর্শন লিখতে আরম্ভ করলেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের সারগর্ভবাণী যখন বৌদ্ধদের মধ্যে অনাস্থা স্থাপন করল তখন সৃষ্ট হল বৌদ্ধদের শূন্যবাদ বা 'শান্তিবাদ'। কিন্তু এদেও শেষ হয় নি। জৈনগণ 'অস্তি' ও 'নাস্তির মধ্যে আর একটা নতুন দর্শনের সৃষ্টি করলেন, যাকে বলা হল "শ্যাদ্বাদ'। এ দর্শন উভয় দর্শনের মধ্যগা পন্থা অবলম্বন করল। এ দর্শনকেই ভিত্তি করে, জৈনগণ ন্যায়, তর্কশাস্ত্র, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আবশ্যক নির্যুক্তিতে পাওয়া যায় ভদ্রবাহু দর্শবিভাগে বিভক্ত করে ন্যায় শিক্ষা

দিয়েছিলেন। এবং সূত্র কৃতাঙ্গ নির্যুক্তিতে পাওয়া যায়, ভদ্রবাহু স্বয়ং 'শ্যাদ্বাদ' শিক্ষা দিয়ে লোকের মন জয় করেছিলেন। জৈনদর্শনে পদার্থ (দ্রব্য), পদার্থজ্ঞান, কালচক্র, কালতত্ব, সৃষ্টি প্রকরণ, আত্মা ও দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতির অপূর্ব ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় জৈন মনীষীরা তাঁদের প্রজ্ঞাশক্তির অপূর্ব পরিচয় ছিয়েছেন। এ মণিষীদের মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য বা এলাচার্য প্রধান। তিনি প্রাকৃত ভাষায় ৮৩টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে (১) পঞ্চাস্তিকায়, (২) প্রবচনসার, (৩) সময়সার, (৪) নিয়মসার, (৫) প্রাভৃত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে ভট্টক স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিলেন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত মূলাচার ও ত্রিবার্ণাচার গ্রন্থে। কার্তিকেয় স্বামীর কার্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা উমাস্বামীনের তত্ত্বার্থধিগমসূত্র, হরিভদ্রের দ্রব্যগুণ, শ্রাবক প্রজ্ঞপ্তি, প্রশমরতি প্রকরণ প্রভৃতি দর্শন উল্লেখযোগ্য।

এভাবে জৈনরা প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে এবং গণিতে, জ্যোতিষে, এমনকি আয়ুর্বেদ, ভূগোল ইতিহাসে, সৃষ্টি প্রকরণে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করে প্রাকৃত সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন।

(জৈন দর্শন ও সংস্কৃতি পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

শ্রমণ পত্রিকার অগ্রহায়ণ,১৪২১ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পণিত ভূমিতে লেখা

[ভগবান মহাবীর পশ্চিম বঙ্গের পণিত ভূমিতে বিচরণ করেছিলেন বলে আচারাঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সূত্র অবলম্বন করে এই কবিতাটি রচিত।]

দেখেছি তোমাকে পথের ওপর,
দেখেছি তোমাকে দুপুর বেলা-
সে কতকাল ?

খুলেছি আকাশ, খুলেছি জানালা ।
পথ হেঁটে যাও দু'চোখ উদাস,
দু' বাহু উদাস,
ঝুরুঝুরু কাঁপে পাতা ।
ধুলো উড়ে যায়,
বেলা বেড়ে চলে,
গ্রামের কুকুর
আসে দলে দলে,
ঘেউ ঘেউ চীৎকার ।
সে কতকাল ?

আপনার মনে পথ হেঁটে যাও,
চাও নাতো কোন দিকে
কেবা এল কাছে,
কেবা গেল দূরে,
কে মারিল ঢিল,
কেবা দিল ফেলে—
ভ্রূক্ষেপ নেই তার।
প্রখর তপন আগুণ ছড়ায়
মাটী হয়ে ওঠে লাল ।
সে কতকাল ?

বৃক্ষের নীচে দাঁড়ায়ে রয়েছ
দ্রুত বেলা ঝরে যায়—
দ্রুত ঝরে যায়,
দ্রুত গলে যায়,
সারাদিন অনাহার,
কাঁপিছেন। তবু বুকের চাতাল,
নড়িছে না তবু ঠোঁটের পাতাল,
দু'চোখ তোমার শান্তির পারাবার !
সে কতকাল ?

আমি হতে চাই তোমার মতন,
গাছের মতন,
মুক্ত জীবন, মুক্ত স্বাধীন,
হে প্রভু আমার !
তোমার মতন কর্ম গহন
করিব দহন করিব দহন -
তোমার মতন করিব বহন
সকল কলুষ ভার।
নড়িবে না মোর বুকের বিশাল,
কাঁপিবে না মোর ঠোঁটের পাতাল,
দু' চোখ আমার শান্তির পারাবার ।
দেখেছি তোমাকে পথের ওপর,
দেখেছি তোমাকে দুপুর বেলা-
সে কতকাল ?

*শ্রমণ পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৮০ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। কবিতাটি কবির নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল।

জৈনধর্ম ও তীর্থঙ্কর মতাদর্শ

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ সালে ভারতবর্ষে মহামানব তীর্থঙ্কর মহাবীরের আগমন ঘটে এবং তিনি এক অভূতপূর্ব দর্শন নিয়ে জ্ঞানজগতে উদিত হন। তিনি পদ্ধতির দিক থেকে নিপুণ এবং সুনির্ধারিত এক তত্ত্ব জগতে প্রচার করেন। এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক এবং জৈন মতে তা শাশ্বতও বটে। এর রয়েছে এক সুনির্দিষ্ট বিশ্বতত্ত্ব। দার্শনিক দিক দিয়েও এই মহান ধর্ম ঋদ্ধ। এই ধর্মের মূল স্তম্ভ তিনটি। অহিংসা তার অন্যতম। এ হচ্ছে সেই ধর্ম, যা অহিংসার উপর ভিত্তি করে অহংকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে মানুষকে তার জীবজ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সক্ষম করে তোলে। এই ধর্মের আরো দুটি মূল স্তম্ভ রয়েছে; যথা: অনেকান্তবাদ ও অপরিগ্রহ। এই অপর দুটি স্তম্ভও যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অনেকান্তবাদ মূলতঃ 'দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য চূড়ান্তভাবে একটিই'- এই চরমপন্থাকে বাতিল করে। এই মতে পরম সত্য জটিল এবং বহুরূপে তা জগতে প্রকাশিত। আর তা বিশদভাবে বোঝার জ্ঞানও সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। এই সত্য বা 'কেবলজ্ঞান' শুধু তিনিই অর্জন করতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যিনি অরিহন্ত। এই অরিহন্ত হচ্ছেন সেই জন, যিনি নিজের ভেতরের তাড়না যথা: রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা এবং লালসাকে জয় করতে পেরেছেন। এই ব্যক্তিই বিজয়ী বা জিন। আর তার অনুসারীগণই জৈন। অনেকান্তবাদ চিন্তার বহুত্বকে অনুমোদন দিয়ে জগতকে বিকশিত ও নিরাপদ করে।

অপরিগ্রহ হচ্ছে সন্ন্যাস চর্চা, যা আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন এবং বস্তুগত আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে মানুষকে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক মার্গে চালিত করে।

জীবনের শেষলগ্নে অরিহন্তগণ কর্মকে ধ্বংস করতে পারেন এবং মোক্ষ অর্জন করে সিদ্ধে পরিণত হন।

যিনি কেবলজ্ঞান অর্জন করেন, তাঁকে কেবলী বলা হয়। জৈন শাস্ত্র অনুযায়ী যদিও কেবলী সাত প্রকার*, তবে সমষ্টি কল্যাণ ও ব্যষ্টি কল্যাণের উপর ভিত্তি করে এখানে দুই প্রকার কেবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে; যথা:

১) শ্রমন কেবলী: ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি নিজের মুক্তি বা মোক্ষ অর্জনে প্রয়াসী। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন।

২) তীর্থঙ্কর কেবলী: তীর্থঙ্কর হচ্ছেন সেই যুগপুরুষ, যিনি নিজেকে সামগ্রিকভাবে জয় করে মোক্ষকে নিজের জন্য নিশ্চিত করেছেন এবং অন্যকে মোক্ষ অর্জনের পথে পরিচালিত করছেন।

জৈনধর্মে প্রতি কালচক্রে ২৪ জন তীর্থঙ্করের আগমন ঘটে। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রকৃত ধর্মের সংস্থাপক এবং মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শক। জৈনধর্মে কালচক্র দুইভাগে বিভক্ত; যথা: উৎসর্পিণী বা কালের আরোহন ভাগ ও অবসর্পিণী বা কালের অবরোহন ভাগ। জৈন মতে মানুষের আয়ু, বল, সুখ, শরীরের পরিমাণ, ইত্যাদির ঊর্ধ্বারোহন কালকে বলে উৎসর্পিণী; আর এসবের ক্রম হ্রাসমান কালকে বলে অবসর্পিণী। প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটে এবং এই সংখ্যা নির্দিষ্ট। এরকমই বর্তমান কালচক্রের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রথম জন ঋষভ দেব এবং শেষ জন নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, যিনি নিজেকে জয় করার কারণে মহাবীর নামে খ্যাত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ সালে বৈশালীতে এক ক্ষত্রিয় রাজ পরিবারে মহাবীরের জন্ম। তার পিতা মহারাজ সিদ্ধার্থ এবং মাতা রানী ত্রিশলা। শৈশব থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী, সুবিবেচক, বীর, অকুতোভয় এবং গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। সেকালে ভারতবর্ষে অর্থাৎ জম্বুদ্বীপে ধর্মের নামে পাপাচার ও পঙ্কিলতা বাড়ছিল, সমাজ ছিল বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে শ্রেণী বিভক্ত। ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল নিম্নবর্ণের মানুষ। তারা অপেক্ষমান ছিলো এক শ্বাশ্বত সত্যের এবং এক আলোকিত পুরুষের। মহাবীর ছিলেন ভারতের সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ এবং সেই মুক্তির দিশারী: যিনি ভারতে ধর্মের ইতিহাসে জ্ঞান, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতার এক সুনিপুণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

---

*যিনি একই সময়ে একই সাথে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ - এই তিন কালের এবং ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক এবং অধোলোক – এই তিন লোকের সমস্ত পদার্থকে তাদের পর্যায়সহ জানতে পারেন, তাঁকেই কেবলী বলা হয়। সাত প্রকারের কেবলীর উল্লেখ জৈন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এঁরা হলেন, ১) তীর্থংকর কেবলী, ২)সামান্য কেবলী, ৩) অন্তঃকৃত কেবলী, ৪) উপসর্গ কেবলী ৫) মুক কেবলী ৬) সমুদ্ঘাত কেবলী ৭) অনুবদ্ধ কেবলী

(লেখক বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা বিদ্বান, লেখক ও গবেষক; সেই সঙ্গে বহুভাষাবিদও)।

আচার্য পাত্র কেশরীর কথা

সুখময় মাজী

আজ আমরা এমন একজন মহাপুরুষের কাহিনী জানব, যিনি বেদাদি শাস্ত্রে মূর্ধন্য পণ্ডিত হয়েও জৈন ধর্মের আলোকে নিজ আত্মাকে আলোকিত করেছিলেন এবং নিজ রাজ্যের রাজা সহ বহু মানুষকে মোক্ষের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম আচার্য পাত্রকেশরী। জৈন সংস্কৃতিতে আচার্য পাত্রকেশরী বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, কারণ তিনি নিজের জীবনে সম্যকদর্শনকে প্রদীপ্ত করেছিলেন। সম্যকদর্শন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই তিনি এই মহামানবের জীবন কাহিনী লিখেছেন বলে 'আরাধনা কথাকোষ'কার কাহিনীর শুরুতেই জানিয়েছেন। চব্বিশ তীর্থংকর ভগবানের পঞ্চকল্যাণক দ্বারা পবিত্র এবং সর্বজীবসুখপ্রদায়ী এই ভারতবর্ষে মগধ নামে একটি দেশ ছিল। এই মগধ দেশ ছিল সংসারের শ্রেষ্ঠ বৈভবের স্থান; মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় উত্তম সম্পদ দিয়ে প্রকৃতি এই দেশকে সাজিয়েছিল। মানুষজনও ছিল সুখী এবং সম্পন্ন। মগধ দেশে ছিল এক সুন্দর নগর; নাম ছিল তার অহিছত্র। যেমন দেশ, তেমনই নগর। অহিছত্র নগরের সৌন্দর্য ছিল পৃথিবীকে চমকে দেওয়ার মত। নগরবাসীদের পুণ্যের ফলে তাদের রাজাও ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। সমস্ত রাজবিদ্যায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত। এই রাজার নাম ছিল অবনিপাল। রাজা অবনিপালের নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত। তিনি গভীর প্রজ্ঞা এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজ্য শাসন করতেন।

তাঁর আশ্রয়ে পাঁচ শত অত্যন্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বেদ এবং বেদাঙ্গের জ্ঞানে সমৃদ্ধ। রাজা অবনিপালকে তাঁরা রাজকার্যে খুব দক্ষতার সাথে সহায়তা করতেন। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও তাঁদের একটি মহাদোষ ছিল। তাঁরা নিজেদের কুলমর্যাদার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত থাকতেন। সেই কারণে তাঁরা সবাইকেই অত্যন্ত নীচু নজরে দেখতেন। তাঁরা সকালে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত খুব নিষ্ঠাভরে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম করতেন। তবে তাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ বিশেষত্ব ছিল। তাঁরা যখন রাজকার্যের জন্য রাজসভায় যেতেন, তার আগে তাঁরা কৌতুহলবশতঃ স্থানীয় পার্শ্বনাথ ভগবানের জিনালয়ে গিয়ে ভগবান শ্রীপার্শ্বনাথের পবিত্র প্রতিমা দর্শন করে যেতেন।

একদিনের কথা। এই বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ যখন নিজেদের সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম করে রাজসভায় যাওয়ার আগে জিনালয়ে এলেন, তখন তাঁরা পার্শ্বনাথ ভগবানের সামনে চারিত্রভূষণ নামক এক মুনিরাজকে 'দেবাগম' নামক এক স্তোত্র পাঠ করতে দেখলেন। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁর নাম পাত্রকেশরী। পাত্রকেশরী চারিত্রভূষণ মুনিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি যে স্তোত্র পাঠ করছেন, তার অর্থ আপনি জানেন কি"? উত্তরে মুনি বললেন, "না, আমি এর অর্থ জানি না"। তখন পাত্রকেশরী বললেন, "মুনিরাজ! আপনি এই স্তোত্রটা আর একবার পড়ুন তো"। পাত্রকেশরীর অনুরোধে মুনিরাজ ধীরে ধীরে এবং পদের শেষে যথাযথ বিরতি দিয়ে দেবাগম স্তোত্রটি আবার পড়লেন। তাঁর পাঠ শুনে সেখানে উপস্থিত লোকেদের মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে গেল। পাত্রকেশরীর মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা ছিল অত্যন্ত বেশি। একবার কোনও কিছু শুনলেই তিনে তা মনে রেখে দিতে পারতেন। তাই, দেবাগম স্তোত্র শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা তাঁর মুখস্থ হয়ে গেল।

এখন তিনি এর অর্থ বিচার করতে শুরু করলেন। এই সময় দর্শনমোহনীয় কর্মের ক্ষয়োপশম হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয়তার সঙ্গে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জীব, অজীব ইত্যাদি পদার্থের যে স্বরূপ জিনেন্দ্র ভগবান বর্ণনা করেছেন, তাই একেবারে সত্য; আর কোনও সত্য নেই। এরপর তিনি বাড়ি গিয়ে বস্তুর স্বরূপ বিচার করতে শুরু করলেন। সারাটা দিন তাঁর তত্ত্ববিচারেই কেটে যেত। রাত্রেও তাঁর একই অবস্থা। কিন্তু কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে তিনি আসতে পারছিলেন না। তিনি বিবেচনা করলেন, জৈন ধর্মে জীবাদি পদার্থ সমূহকে প্রমেয় অর্থাৎ জানার যোগ্য বলা হয়েছে এবং তত্ত্বজ্ঞান তথা সম্যক জ্ঞানকে প্রমাণ বলা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অনুমান প্রমাণের লক্ষণ কোথাও বলা হয় নি। এ রকম কেন? জৈন ধর্মের পদার্থ-সম্বন্ধীয় ধারণায় তাঁর কিছু কিছু সন্দেহ জাগল। ফলে সত্যকে জানার জন্য তাঁর মন ব্যগ্র হয়ে উঠল। আর, এতেই দেবী পদ্মাবতীর আসন টলে উঠল। দেবী পদ্মাবতী তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি পাত্রকেশরীকে বললেন, " হে পাত্রকেশরী! জৈনধর্মের পদার্থ সম্বন্ধীয় ধারণায় তোমার কিছু সংশয় জেগেছে; তাই তো? কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা করো না। কাল সকালে যখন তুমি জিনেন্দ্রদেবকে দর্শন করতে যাবে, তখনই তোমার সব সংশয় দূরীভূত হয়ে অনুমান প্রমাণ বিষয়ে তোমার সন্দেহ মিটে যাবে"। পাত্রকেশরীকে একথা বলে দেবী পদ্মাবতী সেখান থেকে অন্তর্হিতা

হয়ে জিনমন্দিরে গেলেন এবং সেখানে পার্শ্বনাথ ভগবানের প্রতিমার মাথার উপর যে সর্পের ফণা থাকে, সেই ফণার উপরে একটি শ্লোক লিখে দিয়ে তিনি স্বস্থানে ফিরে গেলেন। তিনি যে শ্লোকটি লিখেছিলেন, সেটি হল –

অন্যথানুপন্নত্বং জত্র যত ত্রয়েণ কিম্।
নান্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্।।

অর্থাৎ "যেখানে অন্য রকম অনুপপত্তি রয়েছে, সেখানে হেতু'র অন্য তিন রূপ মানার কী প্রয়োজন? এবং যেখানে অন্য রকম অনুপপত্তি নেই, সেখানে হেতু'র তিন রূপ মান্য করাতেই বা কী ফল"? সাধ্যের অভাবে যা মিলছে না, তাঁকেই অন্যথানুপপন্ন বলে। সেই জন্য অন্যথানুপপত্তি হল হেতু'র অ-সাধারণ রূপ। কিন্তু বৌদ্ধরা এটা না মেনে হেতু'র পক্ষেসত্ত্ব, সপক্ষেসত্ত্ব এবং বিপক্ষাদ্ব্যাবৃত্তি - এই যে তিনটি রূপ মান্য করে, সেই মান্যতা ঠিক নয়। কেননা কোথাও কোথাও ত্রৈরূপ্য না হওয়া সত্ত্বেও অন্যথানুপপত্তির বলেই সেই হেতু সৎ হেতু হয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও ত্রৈরূপ্য বর্তমান থাকে সত্ত্বেও অন্যথানুপপত্তি না হওয়ার কারণে হেতু সৎ হেতু হয় না। যেমন, "এক মুহূর্তের পর শকটের উদয় হবে। কেননা এখন কৃত্তিকা উদিত রয়েছে"। এখানে পক্ষেসত্ত্ব না হওয়া সত্ত্বেও অন্যথানুপপত্তির বলেই এই হেতু সৎ হেতু হয়ে যায়। আবার, "গর্ভস্থ পুত্র শ্যাম হবে, কেননা এ মিত্রের পুত্র" - এখানে ত্রৈরূপ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যথানুপপত্তি না হওয়ার কারণে এই হেতু সৎ হেতু নয়।

পদ্মাবতীর দর্শন ও উপদেশ পেয়ে পাত্রকেশরী আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং জৈন ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে হেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, জৈন ধর্ম সুখপ্রদায়ী এবং সংসারে পরিবর্তনের বিনাশকারী। পরদিন সকালে যখন তিনি জিনমন্দিরে গেলেন এবং পার্শ্বনাথ-প্রতিমার সর্পফণার উপর দেবী পদ্মাবতী দ্বারা লিখিত অনুমান প্রমাণের লক্ষণবোধক শ্লোকটিকে দেখলেন, তখন তাঁর এত আননদ হল যে, সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেমন সূর্য উদিত হলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনই শ্লোকটির দর্শনেই তাঁর সব সংশয় দূর হয়ে গেল।

এরপর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, পুণ্যাত্মা এবং জিনধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধালু পাত্রকেশরী অত্যন্ত প্রসন্নতার সাথে মনে মনে নিশ্চয় করে নিলেন যে, একমাত্র জিন ভগবানই পূর্ণরূপে দোষবিহীন এবং তিনিই সংসার সমুদ্র পার করাতে সক্ষম। জিন ধর্মই স্বর্গ ও মর্ত্য – এই দুই লোকে পরম সুখদাতা ধর্ম হতে পারে। এইভাবে দর্শনমোহনীয় কর্মে ক্ষয়োপশমের ফলে তাঁর সম্যকত্ব রূপী পরম রত্নের প্রাপ্তি হয়ে গেল। এর ফলে তাঁর মন সর্বদা প্রসন্ন থাকত। এখন সবসময় জিনধর্মের তত্ত্বমীমাংসা ছাড়া তাঁর অন্য কিছুতে আসক্তি রইল না। তিনি জৈনতত্ত্ব মীমাংসার বিচারে মগ্ন থাকতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে তাঁর সহকর্মী ব্রাহ্মণেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকাল আমারা দেখছি যে, আপনি মীমাংসা, গৌতম ন্যায়, বেদান্ত, ইত্যাদির পঠনপাঠন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন, আর, তার জায়গায় জিনধর্মের তত্ত্বকেই সর্বদা বিচার করতে থাকছেন। কী ব্যাপার? এর কারণ কী"? পাত্রকেশরী উত্তর দিলেন,"আপনারা পণ্ডিত, কিন্তু আপনাদের মধ্যে আপনাদের বেদজ্ঞানের অহঙ্কার আছে। তার উপরেই আপনাদের অগাধ বিশ্বাস। এইজন্য আপনাদের দৃষ্টি সত্যের দিকে যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। বেদের উপর আমার আস্থা নেই, বরং জিনধর্মের প্রতিই আমার অখণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। আমার তো জৈন ধরমকেই সংসারের সর্বোত্তম ধর্ম মনে হয়। আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বলছি, আপনারা বিদ্বান, আপনারা সত্য-মিথ্যা বিচার করতে সক্ষম; সেইজন্য, যা মিথ্যা, তাকে ছেড়ে সত্যকে গ্রহণ করুন; আর, এই সত্য ধর্ম একমাত্র জিনধর্ম। সেই কারণে এটা গ্রহণ করার যোগ্য"।

পাত্রকেশরীর এই উত্তরে ব্রাহ্মণরা তো সন্তুষ্ট হলেন না। তাই তাঁরা পাত্রকেশরীর সাথে বিতর্কে নামার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা পাত্রকেশরীর সাথে শাস্ত্র বিচার করার অনুমতি চাইলেন। রাজা অনুমতি দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে পাত্রকেশরীকে রাজসভায় আহ্বান করা হল। তাঁর সাথে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ বিতর্ক হল। পাত্রকেশরী সমস্ত ব্রাহ্মণকে পরাজিত করে সংসারের পরম পূজ্য এবং প্রজাদের সুখপ্রদায়ী জিনধর্মের গৌরব অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সম্যক দর্শনের মহিমা প্রকাশিত করলেন। তিনি এক জিনস্তোত্র রচনা করলেন, যাতে জিনধর্মের তত্ত্বগুলির বিবেচন এবং অন্য বিভিন্ন মতের তত্ত্বসমূহকে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের সাথে খণ্ডন করলেন। এই স্তোত্রের পঠনপাঠন সবার জনই সুখের

কারণস্বরূপ। পাত্রকেশরীর এই শ্রেষ্ঠ গুণ দেখে বড় বড় বিদ্বানরা তাঁকে আদর ও শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এবং রাজা অবনিপাল এবং পাত্রকেশরীর সহকর্মী সেই ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা মত ত্যাগ করে অত্যন্ত শুভ ভাবনার সাথে জৈন মত গ্রহণ করলেন।

এইরূপে পাত্রকেশরীর উপদেশে সংসার সমুদ্র পার করতে সক্ষম সম্যকদর্শন এবং স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদায়ী পবিত্র জিনধর্ম গ্রহণ করে রাজা অবনিপাল এবং অন্যান্যরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পাত্রকেশরীর ভূয়সী প্রসংসা করলেন, "হে দ্বিজোত্তম, আপনি গভীর পাণ্ডিত্যের সাথে জৈন ধর্ম খুঁজে বের করেছেন। আপনিই জিন ভগবানের দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্বের মর্মকে ভালোভাবে বুঝেছেন। আপনিই জিন ভগবানের চরণকমল দুটিকে সেবা করার উপযুক্ত প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আপনার যতই প্রশংসা করি না কেন, সবই যেন কম মনে হয়"। এইভাবে পাত্রকেশরীর গুণ এবং পাণ্ডিত্যের আন্তরিক ও অকপট প্রশংসা করে তাঁরা সবাই তাঁর বড় আদর এবং সম্মান করলেন।

যেভাবে পাত্রকেশরী সুখের কারণস্বরূপ পরম পবিত্র সম্যক দর্শনকে ভাস্বর করে সংসারে তার আলোক প্রকাশিত করে রাজাদের দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই রকম আরও যাঁরা জিনধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ভক্তিপূর্বক সম্যক দর্শনকে উদ্যোত করবেন, তাঁরাও যশস্বী হয়ে শেষে স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করবেন।

কাহিনীর উপসংহারে আরাধনা কথাকোষকার বলছেন, "কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, ইত্যাদির মত নির্মল এবং কীর্তিমান শ্রী কুন্দকুন্দাচার্যের আম্নায়ে শ্রী মল্লিভূষণ ছিলেন ভট্টারক। তাঁর গুরুভাই ছিলেন শ্রুতসাগর। তারই আজ্ঞায় আমি সিংহনন্দী মুনির নিকট অবস্থান করে আমি এই গাথা রচনা করলাম। এর দ্বারা আমারও সম্যকত্ব রত্নের প্রাপ্তি হোক"।

জৈন ধর্ম; সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার এক জীবনপ্রণালী

রজত সুরাণা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়টি আভ্যন্তর তপ হল প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত অর্থাৎ পূজ্য ব্যক্তিদের সেবা, স্বাধ্যায়, ব্যুতসর্গ অর্থাৎ অহং ভাব ত্যাগ করা ও ধ্যান। **প্রায়শ্চিত্তবিনয়বৈয়াবৃত্তস্বাধ্যায়ব্যুতসর্গধ্যানান্যুত্তরম্।** (তত্ত্বার্থসূত্র 9/20)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা মনে হতে পারে যে, আমরা এখানে ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত গাইতে শুরু করেছি। যেখানে বিষয়টা হচ্ছে, জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক সম্বন্ধে জৈন ধর্ম কী পরামর্শ দেয়, সেখানে এই আড়াই পাতা ব্যাপী ভূমিকার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা, সেই প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। এর উত্তর হল, জৈন ধর্ম, দর্শন ও আচার সংহিতার প্রাথমিক দিকগুলি আলোচনার পর যদি বিষয় ধরে ধরে আলোচনায় প্রবেশ করি, তাহলে পুরো বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধা হবে। সেজন্যই এই গৌরচন্দ্রিকা। এবং পরবর্তী অংশেও স্থানে স্থানে প্রয়োজন অনুসারে কিছু বিষয় একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হবে।

আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই ১) প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাতকের স্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য এবং কিশোর স্বাস্থ্য, ২) পুষ্টি, ৩) জল, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ৪) শিশু সুরক্ষা এবং শিক্ষা।

জৈন ধর্মের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেটা হল, সাধারণভাবে অবহেলিত মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিও এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্লান্তি, অনিদ্রা, পেশী ব্যথা, পিঠে ব্যথা, অনিয়মিত, রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, বদহজম, মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেন, ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (পুরুষত্বহীনতা), ডার্মাটাইটিস, পেপটিক আলসার ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের কারণ মানসিক স্বাস্থের অসমঞ্জসতা।

এই পটভূমিকায় আমরা যখন প্রজনন, মাতৃত্ব, নবজাতক, শিশু এবং কিশোর স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করব, তখন স্বাস্থ্যের এই বৃহত্তর ধারণার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। জৈন ধর্মের একটি বিশেষ প্রথা হল, সামায়িক। **দিগ্দেশানর্থদণ্ড-বিরতি-সামায়িক-প্রৌষধোপবাসোপভোগ-**

পরিভোগ-পরিমাণাতিথিসংবিভাগব্রতসম্পন্নশ্চ (তত্ত্বার্থসূত্র 7/21)। সামায়িক প্রতিটি শ্রাবক শ্রাবিকার অবশ্য কর্তব্য। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, সংসারী মানুষের পক্ষে মহাব্রত পালন অসম্ভব। তাই **সামায়িক** ব্রতে এক মুহূর্ত অর্থাৎ ৪৮ মিনিট প্রতিটি শ্রাবক পঞ্চ মহাব্রত ধারণ করে 'স্ব-সময়' অর্থাৎ নিজ আত্মায় লীন হওয়ার চেষ্টা করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সময়টুকু অধিকাংশ স্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। পর্বের দিনগুলিতে তাঁরা মন্দিরে অথবা আচার্যের নিকট থেকে মান, মায়া, ক্রোধ, লোভ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন, যেটাকে বলা হয় **প্রৌষধোপবাস**। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্রতগুলি তাঁদের মনকে শান্ত তথা মানসিক স্বাস্থ্যকে সন্তুলিত রাখতে সহায়তা করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়মিত উপবাস শ্রাবকশ্রাবিকার অবশ্য কর্তব্য। উপবাসের কিছু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা আছে। যেমন -

1. ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
2. ইনসুলিন প্রতিরোধের হ্রাস শরীরের ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়াতে পারে, ফলে রক্ত প্রবাহ থেকে কোষে কোষে গ্লুকোজ পরিবহন সহজ হয়।
3. উপবাস রক্তে শর্করাকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে।
4. শরীরের বিভিন্ন স্থানে inflammation বা প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নত স্বাস্থ্যের সহায়ক হয়। প্রদাহ দীরঘস্থায়ী হলে হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়ে।
5. রক্তচাপ, ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করে হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারে। একটি ছোট সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আট সপ্তাহের পর্যায়ক্রমে উপবাসের ফলে "খারাপ" এলডিএল কোলেস্টেরল এবং রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা যথাক্রমে 25% এবং 32% কমে যায় (9 বিশ্বস্ত উৎস)।
6. প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উপবাস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে, স্নায়ু কোষের সংশ্লেষণ বাড়াতে পারে এবং নিউরো-ডিজেনারেটিভ অবস্থার বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে, যেমন অ্যালঝাইমার এবং পারকিনসন্স রোগ।

7. ক্যালোরি গ্রহণ সীমিত করে উপবাস বিপাক বৃদ্ধি করে ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিছু গবেষণায় আরও পাওয়া গেছে যে স্বল্পমেয়াদী উপবাস নিউরোট্রান্সমিটার নরএপিনেফ্রিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে বিপাককে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা ওজন কমাতে পারে। শরীরের চর্বি কমাতে পেশী কলা সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে।
8. বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, উপবাস মানুষের বৃদ্ধির হরমোন (HGH), একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন হরমোনের মাত্রা বাড়াতে পারে, যা বৃদ্ধি, বিপাক, ওজন হ্রাস এবং পেশীর শক্তিতে ভূমিকা পালন করে।
9. প্রাণী গবেষণায় দেখা গেছে যে উপবাস বার্ধক্যকে বিলম্বিত করতে পারে এবং দীর্ঘায়ু বাড়াতে পারে, তবে মানুষের উপর গবেষণার এখনও প্রয়োজন রয়েছে।
10. উপবাস ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে এবং কেমোথেরাপির কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

(উপরিউক্ত তথ্যাবলীর উৎস: https://www.healthline.com › Wellness Topics › Nutrition)

জৈন শ্রাবকশ্রাবিকাদের জন্য দ্বিতীয় বাহ্য তপ হল **অবমৌদর্য** অর্থাৎ খিদের তুলনায় কম খাওয়া। এর উপকারিতা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাংলায় প্রচলিত আছে, "যদি বেশি খেতে চান, তবে কম খান"। অর্থাৎ সুস্থ দেহে বেশিদিন ভোজনক্ষম থেকে বাঁচার রাস্তা হল অবমৌদর্য। গ্যাস, অম্বল, অজীর্ণ, ইত্যাদি রোগকে দূরে রাখে অবমৌদর্য। অল্পবয়সকে ধরে রাখার জন্য আজকাল যে ডায়েটিং-এর প্রচলন হয়েছে, সেটা তীর্থংকর ভগবান বহু আগেই অবমৌদর্যরূপে আমাদের জন্য প্রেস্ক্রাইব করেছেন। অবমৌদর্য আমাদের এনার্জেটিক রাখে। কম খাবার খাওয়ার অর্থ হল আপনার শরীরে সীমিত ক্যালোরি গ্রহণের যোগান দেওয়া হয়। পরিপাক সর্বাধিক হয়, পুষ্টিদ্রব্যের সঠিক শোষণ এবং চর্বি হিসাবে অবাঞ্ছিত ক্যালোরির ন্যূনতম সঞ্চয় হয়। এইভাবে, কম চর্বি জমার পাশাপাশি, আমাদের সম্পূর্ণ বিপাকীয় হার বৃদ্ধি পায়। এবং তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুণমানে প্রতিফলিত হয়। আমরা সারাদিন আরও উদ্যমী বোধ করতে বাধ্য, আরও পরিষ্কার চিন্তা করতে সক্ষম হই এবং দিনের কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের নতুন উদ্যম থাকে। সারা বিশ্বের চিকিৎসা গবেষকরা বারবার কম খাওয়া এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা উন্নত করার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রমাণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীয় ক্ষমতা এবং সামগ্রিক আইকিউ।

প্রকৃতপক্ষে, মনকে শাণিত করার জন্য সীমিত খাদ্য গ্রহণের অনুশীলন হাজার হাজার বছর আগে বিদ্যমান জৈন সংস্কৃতিতে করা হয়েছে। এই ধারণাটি এখনও সত্য। এটি আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ভারী খাবারের পরিবর্তে ছোট অংশে এবং নিয়মিত বিরতিতে খাওয়া শিক্ষার্থীদের সহজে শেখার এবং মুখস্থ করার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

আমরা হয়ত এটা উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রদাহের ফলে অনেক রোগ হয়। এর মানে হল যে তারা সংক্রমণের মতো বাহ্যিক কারণ ছাড়াই সৃষ্ট হয়। এটি ঘটে যখন শরীর খাদ্যে পাওয়া টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থগুলি থেকে পরিত্রাণ পেতে অক্ষম হয়। আমরা যখন বেশি খাই তখন এই ধরনের টক্সিন ধরে রাখার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পাচনতন্ত্র একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মতো কাজ করে যার মধ্যে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মাধ্যমে খাদ্যের সঞ্চরণ এবং অনেক অঙ্গের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত। যখন এই সিস্টেমে অতিভোজনের ফলে চাপ পড়ে, তখন হজম হওয়া খাবারের গতিবিধি ব্যাহত হয়। এটি শরীরকে সঠিকভাবে টক্সিন ফিল্টার-আউট করতে দেয় না। এইভাবে টক্সিনগুলি রক্তের প্রবাহে ফিরে আসে, রোগব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য একটি সরাসরি হুমকি এবং কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই আমাদের শরীরকে রোগের বিকাশের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে।

বিষয়টি গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। গর্ভাবস্থায় মায়েদের শরীরে অধিক পরিমানে আয়রন যৌগের প্রয়োজন হয়। তাই সরকারিভাবে ফেরাস সালফেট ট্যাবলেট দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফেরাস সালফেট মাঝারি ধরণের কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি করে। এছাড়াও গর্ভাবস্থায় আহারে রুচি কমে যাওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়। জৈন আহার নিরামিষ অর্থাৎ মূলতঃ উদ্ভিজ্জ। আর, আমরা সবাই জানি, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রানীজ প্রোটিনের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনের বেশি শরীরে শোষিত হয়। তাছাড়াও উদ্ভিজ্জ আহারে ফাইবার বেশি থাকার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য কমে যায়। উদ্ভিজ্জ খাবারে ভিটামিন ও খনিজ লবন বেশি থাকে। এই অবস্থায় **অবমৌদর্য** গর্ভবতী মা'কে চনমনে ও উজ্জীবিত রাখতে সহায়তা করে। ফলে ভাবী সন্তানেরও শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রাণীজ প্রোটিনের উৎস হিসাবে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের আহার জৈন শাস্ত্র অনুমোদিত।

(ক্রমশঃ)

আগম পাঠ; ভগবতী সূত্র

-শ্রীকান্ত জৈন

দ্বাদশাঙ্গী জৈন আগম শাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চম আগম গ্রন্থ হল ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি। এটি বর্তমানে ভগবতী সূত্র নামেই অধিক জনপ্রিয়। অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থের প্রাকৃত নাম হল বিহায়পণ্ণত্তি। 'বিহায়পণ্ণত্তি' শব্দটি 'বিহায়' এবং 'পণ্ণত্তি' – এই দুই শব্দের সংযোগে গঠিত। সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করলে আমরা 'বিহায়' শব্দের তিনটি রূপ পেতে পারি; ব্যাখ্যা, বিবাহ এবং বিবাধ। অনুরূপে 'পণ্ণত্তি' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর হতে পারে প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞাপ্তি। তাহলে 'বিহায়পণ্ণত্তি' শব্দের সর্বাধিক ছয়টি সংস্কৃত রূপ আমরা পেতে পারি। সংস্কৃত রূপ পাওয়ার প্রয়োজন এই কারণেই যে, আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে, যেগুলি তৎসম শব্দ নামে পরিচিত। এবং এই শব্দগুলি বাংলা ভাষায় সেই অর্থকেই প্রকাশ করে, যে অর্থে তাঁরা সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়। 'বিহায়পণ্ণত্তি' শব্দের সম্ভাব্য ছয়টি সংস্কৃত (ও বাংলা) রূপভেদের মধ্যে চূর্ণিকার চারটি শব্দকে গ্রহণ করেছেন। অতএব এই চারটি শব্দই পণ্ডিতমহলে গৃহীত হয়েছে। এগুলি হল – ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপ্তি, বিবাহপ্রজ্ঞপ্তি এবং বিবাধপ্রজ্ঞপ্তি। ব্যাখ্যা শব্দের অর্থ তো আমরা সবাই জানি; ব্যাখ্যান, বর্ণন বা বিশ্লেষণ। প্রজ্ঞপ্তি শব্দের অর্থ শিক্ষা বা সিদ্ধান্ত। এই মহাগ্রন্থে গৌতম স্বামী প্রমুখ শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান মহাবীর জীব, অজীব, ইত্যাদি অনেক জ্ঞেয় পদার্থের যে শিক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা সহযোগে দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষাই জম্বুস্বামীসহ অন্যান্য শিষ্যদের কাছে শ্রী সুধর্মা স্বামী সবিস্তারে ব্যাখ্যান করেছিলেন। এই ব্যাখ্যানই ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি। অন্যভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্রে ভগবানের বচনকে প্রজ্ঞাপন ও প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রই ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি। যদি পণ্ণত্তি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপ্তি ধরা হয়, তাহলে তাঁকে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দু'টি শব্দ পাই – প্রজ্ঞা এবং আপ্তি (প্রাপ্তি বা লাভ)। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, ভগবানের দ্বারা প্রতিপাদিত প্রজ্ঞার প্রাপ্তি যে গ্রন্থ পাঠ করলে হয়, তা'ই ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপ্তি। বিবাহপন্নাপ্তি শব্দে বি উপসর্গ যোগে বহ্ ধাতু থেকে বিবাহ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বহ্ ধাতুর অর্থ বহন করা, বয়ে চলা বা প্রবাহ। তখন অর্থ হবে, যে শাস্ত্রে বিবিধ এবং বিশিষ্ট অর্থপ্রবাহের অথবা নয়প্রবাহের প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে, সেটাই বিহায়পণ্ণত্তি। বিবাধ শব্দের অর্থ বাধারহিত অর্থাৎ

অবাধ। যে শাস্ত্রে ভগবানের বাণীকে বাধারহিতভাবে প্রজ্ঞাপন করা হয়েছে, সেই গ্রন্থই বিহায়পন্নত্তি। উপরোক্ত চারটি সংস্কৃত নামের মধ্যে জৈন সমাজে ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি নামটিই সর্বজনগ্রাহ্যরূপে মান্যতা পেয়েছে। অচেলক পরম্পরায় এই নামটিই স্বীকৃত। আবার অন্যান্য অঙ্গসমূহের তুলনায় বিশালতর এবং অধিক আদরণীয় হওয়ার জন্য এর আর এক নাম হয়েছে 'ভগবতী' সূত্র। এই গ্রন্থে মহাবীর স্বামী এবং গৌতম গণধরের কথপকথনের মধ্য দিয়েই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিএ প্রতিপাদন করা হয়েছে। গণধর গৌতম স্বামী ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন এবং ভগবান মহাবীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহযোগে তাঁর সমস্ত সংশয়ের সমাধান করেছেন।

সমবায়াঙ্গ এবং নন্দীসূত্র থেকে জানা যায় যে, ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিতে নানা বিষয়ের উপর ৩৬০০০ প্রশ্নের ব্যাখ্যা আছে। বিবিধ দেবতা, বহু রাজা, অনেক দেবর্ষি, গণধর গৌতম, বিভিন্ন অনগার সন্ন্যাসী, ইত্যাদি অনেকে এই প্রশ্নগুলি ভগবানের সম্মুখে রেখেছিলেন। কষায়পাহুড় থেকে জানা যায়, জীব-অজীব, স্বসময়-পরসময়, লোক-অলোক, ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রায় ৬০ হাজার প্রশ্নোত্তর এই শাস্ত্রে রয়েছে। আচার্য অকলঙ্ক বলেছেন, "জীব অর্থাৎ আত্মা আছে, নাকি নেই", ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য বীরসেন বলেন, প্রশ্নোত্তর ছাড়াও ছিন্নছেদনয় দ্বারা জ্ঞাপনীয় ১৬ হাজার শুভ ও অশুভের বর্ণনা এই মহাপুস্তকে রয়েছে।

প্রাচীন তালিকা অনুসারে এই আগমে একটি শ্রুতস্কন্ধ শতাধিক অধ্যায় বা শতক, দশ হাজার উদ্দেশনকাল, দশ হাজার সমুদ্দেশনকাল, ছত্রিশ হাজার প্রশ্নোত্তর, দশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার পদ এবং সংখ্যাত পরিমাণ অক্ষর আছে। বর্তমানে উপলব্ধ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিতে মোট ৪১টি শতক আছে। শতক শব্দ 'শত' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। প্রত্যেক শতকে উদ্দেশকরূপ উপবিভাগ আছে। কতকগুলি শতকে দশটি করে উদ্দেশক আছে, কতকগুলিতে এর চেয়ে বেশি। ৪১ তম শতকে ১৯৬টি উদ্দেশক রয়েছে।

এই শাস্ত্রগ্রন্থে ভগবান মহাবীরের জীবনচরিত, তাঁর শিষ্য, ভক্ত, গৃহস্থ, উপাসক, অন্যতীর্থিক গৃহস্থ, পরিব্রাজক, আজীবক, এবং তাঁদের মান্যতার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে এতে সেই যুগে প্রচলিত অনেক ধর্মসম্প্রদায়, দর্শন, মতবাদ ও সেইসব মতের অনুসারীদের মনোবৃত্তি,

এবং কয়েকজন সাধকের জিজ্ঞাসাপ্রধান, সত্যাগ্রাহী, সরল, অসাম্প্রদায়িক উদারবৃত্তিও পরিলক্ষিত হয়। এতে জৈন সিদ্ধান্ত, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়কেই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যার এমন কোনও শাখা নেই, যার চর্চা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে এই মহাগ্রন্থে আলোচিত হয় নি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে অন্যান্য আগমশাস্ত্রের তুলনায় এতে ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রারম্ভিক সামান্য ভূমিকার পর এবার আমরা প্রথম শতকে প্রবেশ করতে পারি। এই শতক দশটি উদ্দেশকে বিভক্ত। উদ্দেশকগুলি হল, চলন, দুঃখ, কাঙ্ক্ষাপ্রদোষ প্রকৃতি, পৃথ্বীসমূহ, যাবন্ত, নৈরয়িক, বাল, গুরুক এবং চলনাদি। প্রথম উদ্দেশক শুরু করার আগে শাস্ত্রকার বিষয়সূচী দিয়ে শ্রুতদেবতাকে নমস্কার করার মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ করেছেন। প্রথম উদ্দেশকের প্রারম্ভে 'চলমানে চলিএ', ইত্যাদি পদগুলির একার্থ, নানার্থ , প্ররূপণা, চব্বিশ দণ্ডকের স্থিতি আদির বিচার, জীবের আরম্ভ প্ররূপণা, ভবের সাপেক্ষে জ্ঞান আদি প্ররূপণা, অসংবৃত-সংবৃত সিদ্ধিবিচার, অসংযত জীব, দেবগতিবিচার, ইতাদি বিষয়ের নিরূপণ করেছেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশকে জীবের সাপেক্ষে একত্ব-পৃথকত্ব রূপে দুঃখবেদন-আয়ুষ্যবেদন প্ররূপণ, চব্বিশ দণ্ডকে মাংসাহারাদি সপ্ত দ্বার প্ররূপন, জীবাদির সংসার স্থিতিকালের ভেদাভেদ, অল্প-বহুত্ব-অন্তক্রিয়াকারকাদি নিরূপণ, দর্শনব্যাপন্ন পর্যাপ্তক অসংযত-ভব্য- দেবাদির বিপ্রতিপত্তি বিচার, অসংজ্ঞী জীবের আয়ু, আয়ুবন্ধ, অল্প-বহুত্বের বিচার প্রতিপাদিত হয়েছে।

তৃতীয় উদ্দেশকে সংসারী জীবের কাঙ্ক্ষামোহনীয় কর্মের বিষয়ে বিবিধ দিকের বিচারবিবেচনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

চতুর্থ উদ্দেশকে কর্মপ্রকৃতিসমূহের বন্ধের এবং মোক্ষের আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম উদ্দেশকে নারকী আদি ২৪ দণ্ডকের স্থিতি, অবগাহনা, শরীর, সংহনন, সংস্থান, লেশ্যা, দৃষ্টি, জ্ঞান, যোগ, উপযোগ, ইত্যাদি বিষয় দ্বারের সাপেক্ষে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ উদ্দেশকে সূর্যের উদয়াস্তের অবকাশ, প্রকাশ, লোকান্তাদি স্পর্শনা, ক্রিয়ারোহ প্রশ্ন, লোকস্থিতি, স্নেহকায়, ইত্যাদির নিরূপণ করা হয়েছে।

সপ্তম উদ্দেশকে নারক আদি ২৪ দণ্ডকের জীবসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বিগ্রহগতি এবং গর্ভস্থ জীবের আহারাদির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম উদ্দেশকে বাল, পণ্ডিত এবং বালপণ্ডিত মানুষের আয়ুষ্যবন্ধ, কায়িকাদি ক্রিয়া, জয়পরাজয়, হেতু, সবীর্যত্ব-অবীর্যত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম উদ্দেশকে বিবিধ বিষয়ের গুরুত্ব-লঘুত্ব, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

অন্তিম তথা দশম উদ্দেশকে 'চলমানে চলিএ' ইত্যাদি সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে অন্যতীর্থিক প্ররূপণা প্রস্তুত করে তাঁদের নিরাকরণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সমস্ত জীবের সমস্ত রকম পরিস্থিতির বিষয়ে এই শতকে আলোচনা করা হয়েছে। এই দিক থেকে এই শতক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি তথা ভগবতীসূত্রের প্রথম শতকের প্রথম উদ্দেশকের বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে শুরু করা যেতে পারে। সমগ্র শাস্ত্রের মঙ্গলাচরণরূপে যে সূত্র দিয়ে এই শতকের এই উদ্দেশক শুরু করা হয়েছে, তার প্রথম পাঁচ পঙ্ক্তি হল সারা বিশ্বের সমগ্র জৈন সমাজের কাছে সবচেয়ে মহান মন্ত্র 'ণমোকার মহামন্ত্র'। মন্ত্রটি সমস্ত জৈন ধর্মাবলম্বীর কণ্ঠস্থ। নিম্নে মন্ত্রটি উল্লেখ করা হল।

ণমো অরহংতাণং।
ণমো সিদ্ধাণং।
ণমো আয়রিয়াণং।
ণমো উবজ্ঝায়াণং।
ণমো লোয়ে সব্বসাহুণং।
ণমো বংভীএ লিবীএ।।১।।

পুরো শাস্ত্রগ্রন্থটির মতই এই ণমোকার মন্ত্রটিও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। প্রাকৃত ভাষার নিয়ম অনুযায়ী অনুস্বারের উচ্চারণ পরবর্তী বর্ণের বর্গের পঞ্চম বর্ণের মতো হয়, এবং অন্ত-অনুস্বারের উচ্চারণ 'ম্' হয়। তাই মন্ত্রটির উচ্চারণ হবে নিম্নরূপ –

ণমো অরহন্তাণম্।
ণমো সিদ্ধাণম্।

ণমো আয়রিয়াণম্।
ণমো উবজ্ঝায়াণম্।
ণমো লোএ সব্বসাহুণম্।

আবার, মন্ত্রের প্রথম বাক্যটির বিভিন্ন পাঠভেদও পাওয়া যায়। অরহন্ত, অরিহন্ত, অরুহন্ত, ইত্যাদি। যদিও এই সব শব্দ ব্যুৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশক, তবুও এগুলি তীর্থংকর ভগবানের দ্যোতক হিসাবেই প্রযুক্ত হয়। অথচ কৌতূহলদ্দীপক বিষয় এটাই যে, জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী অরিহন্ত যে কেউ হতে পারেন, কিন্তু পূর্ববর্তী কোনও ভবে তীর্থংকর নামকর্মের বন্ধ না হলে তীর্থংকর হওয়া যায় না। একই ক্ষেত্রে একই সময়ে অনেক অরিহন্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সমকালে সমস্থানে একাধিক তীর্থংকর হতে পারেন না। যাই হোক, অরহন্ত শব্দের যে সব রূপভেদ পাওয়া যায়, সেগুলির সংস্কৃতায়ন করলে আমরা সাতটি শব্দ পাই। অর্হন্ত, অরোহন্তর, অরথান্ত, অরহন্ত, অরহয়ৎ, অরিহন্ত, এবং অরুহন্ত। এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন বিদ্বান এবং পণ্ডিত বিভিন্ন লেখায় দিয়েছেন। তবে আমার কাছে অরহন্ত শব্দের দুটি রূপ সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে - অর্হন্ত এবং অরিহন্ত। অর্হৎ শব্দের অর্থ পূজ্য। "গৌরবার্থে বহুবচন" নিয়মানুসারে অর্হৎ শব্দ অর্হন্ত শব্দে পরিণত হয়েছে এবং স্বরভক্তির নিয়মে অর্হন্ত শব্দ অরহন্ত শব্দে পরিণত হয়েছে। আর অরিহন্ত শব্দের অর্থ যিনি অরি অর্থাৎ শত্রুদের বিনাশ করেছেন। এখানে শত্রু বলতে কোনও বহিঃশত্রুর কথা বলা হয় নি। আমাদের অন্তরের ক্রোধ, মান, মায়া লোভ, রাগ, দ্বেষ, ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিই হল আমাদের আসল শত্রু। আমাদের এই আন্তরিক শত্রুগুলিই আসলে অপরের সাথে শত্রুতার কারণ। যিনি অন্তরের শত্রুদের জয় করতে পারেন, তাঁর কোনও বাহ্য শত্রু থাকাই অসম্ভব। ইনি সেই আন্তরিক শত্রুগুলিকে দমন করেছেন বলেই ইনি অরিহন্ত। তবে ইদানীং দু একজন পণ্ডিত অরিহন্ত শব্দকে অর্হন্ত শব্দের বিকৃতি বলেই মনে করছেন। কারন অরিহন্ত শব্দে হন্ ধাতু রয়েছে যা হিংসাবাচক। অহিংসাপ্রধান জৈন ধর্মে এই ধাতু তাই নিতান্তই বেমানান বলে তাঁরা মনে করেন।

অর্হন্ত শব্দের দ্বারা সেই লোকপূজ্য পুরুষকে বোঝায়, যিনি দেবনির্মিত অষ্টপ্রতিহার্য রূপ পূজা পাওয়ার যোগ্য। ইনি ইন্দ্রের দ্বারাও পূজনীয়। 'রহ' শব্দের অর্থ একান্ত এবং 'অন্তর' শব্দের অর্থ ভেতর। তাই, অরহোন্তর শব্দের দ্বারা সেই সর্বজ্ঞ পুরুষকে বোঝায়, যার কাছে একান্ত এবং

অন্তরে অপ্রকাশ্য অবস্থায় থাকা কোনও ভাবই গোপন থাকে না। ইনি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা পুরুষ। অরথান্ত শব্দে তিনটি অংশ; অ-রথ-অন্ত। রথ শব্দ পরিগ্রহবোধক এবং অন্ত শব্দের অর্থ মৃত্যু। তাহলে যিনি সর্ব প্রকার পরিগ্রহ এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত, তিনিই অরথান্ত। অরহন্ত শব্দের অর্থ হল যিনি আসক্তি থেকে মুক্ত। অর্থাৎ যিনি রাগের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ ঘটিয়েছেন। তীব্র রাগ অর্থাৎ আকর্ষণ বা আসক্তির কারণভূত মনোহর বিষয়ের সংসর্গ হলেও যিনি পরম বীতরাগ হওয়ার কারণে সামান্যতমও রাগভাব প্রাপ্ত হন না তিনিই অরহয়ৎ। বিশিষ্ট সাধনা দ্বারা তিনি চারপ্রকার ঘাতী কর্মরূপ শত্রুকেও ক্ষয় করেছেন। অরুহন্ত শব্দের মধ্যে 'রুহ' অংশটির অর্থ হল সন্তান পরম্পরা। যিনি কর্মরূপী বীজকে দগ্ধ করে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে আসা সংসারের পরম্পরাকে সর্বতোভাবে বিনষ্ট করেছেন, তিনিই অরুহন্ত। ণমোকার মন্ত্রের প্রথম বাক্যের মধ্য দিয়ে এই ধরণের সমস্ত জীবকে নমস্কার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত সিদ্ধ জীবকে নমস্কার করা হয়েছে। সিদ্ধ কারা? যাঁরা চার প্রকার ঘাতী কর্ম এবং চার প্রকার অঘাতী কর্ম ক্ষয় করে চিরতরে সংসারবন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষ লাভ করেছেন, তাঁরাই সিদ্ধপুরুষ। তাঁরা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং অব্যবাধ সুখের অধিকারী হয়ে চিরকালের জন্য ত্রিলোকের অগ্রভাগে সিদ্ধশিলায় বিরাজমান রয়েছেন।

আয়রিয় শব্দের অর্থ আচার্য। যে পঞ্চমহাব্রতধারী মুনি শ্রমণ সংঘকে পরিচালনা করেন, জ্ঞানাদি পঞ্চ আচার নিজে পালন করেন এবং সাধু-সাধ্বী সঙ্ঘকেও সেগুলি পালন করতে প্রেরিত করেন, তিনিই আচার্য।

উবজ্ঝায় শব্দের অর্থ উপাধ্যায়। পঞ্চমহাব্রতধারী যে সাধু স্বয়ং শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন এবং অন্যদের শাস্ত্রাধ্যয়ন করান, তাঁকে উপাধ্যায় বলা হয়।

লোএ শব্দের অর্থ লোকে অর্থাৎ বিশ্বসংসারে এবং সব্বসাহু শব্দের অর্থ সর্বসাধু। "লোএ সব্বসাহুণং" শব্দবন্ধের অর্থ "জগতের সমস্ত সাধুদেরকে"। গৃহস্থ ধর্ম ত্যাগ করে যিনি পঞ্চ মহাব্রত ধারণ করেন এবং সাধুদের জন্য শাস্ত্র-নির্দেশিত আচারসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালনের মাধ্যমে মোক্ষের সাধনা করেন, তাঁদেরই সাধু বলা হয়। সম্যক জ্ঞান, সম্যক দর্শন এবং সম্যক চারিত্রের অধিকারী না হলে প্রকৃত অর্থে তাঁকে সাধু বলা যাবে না।

সর্বসাধু কথাটির আরেকটি তাৎপর্য রয়েছে। সর্ব শব্দের মধ্য দিয়ে সমস্ত রকমের সাধুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; সে তিনি সামায়িক চারিত্রের অধিকারী হন, অথবা ছেদোপস্থানীয়, পরিহারবিশুদ্ধি, সূক্ষ্মসম্পরায় অথবা যথাখ্যাত চারিত্রের অধিকারীই হন না কেন। অথবা তিনি সপ্তম থেকে একাদশতম যে কোনও গুণস্থানেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন। অথবা তিনি পুলাকাদি পাঁচ রকমের নির্গ্রন্থের মধ্যে যে কোনও প্রকার হতে পারেন। তিনি জিনকল্পী হতে পারেন, স্থবিরকল্পী হতে পারেন অথবা প্রতিমাধারী, যথালন্দকল্পী বা কল্পাতীতও হতে পারেন। কিংবা, তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ হতে পারেন, স্বয়ংবুদ্ধ হতে পারেন, অথবা বুদ্ধবোধিত। তিনি ভরতক্ষেত্রে থাকতে পারেন, অথবা মহাবিদেহ ক্ষেত্র, ধাতকীখণ্ড ইত্যাদি যে কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকতে পারেন।

এই প্রথম শ্লোকটির শেষ পঙ্ক্তিটি হল – **"णमो बंभीए लिवीए"** অর্থাৎ ব্রাহ্মীলিপিকে নমস্কার। এখানে ব্রাহ্মীলিপিকে নমস্কার করার বিষয়টি একটু আশ্চর্য লাগতে পারে। কেননা ণমোকার মহামন্ত্রের অংশ নয় এই পঙ্ক্তিটি। তাহলে মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে ণমোকার মন্ত্রের শেষে এটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কেন? বিষয়টি একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীনকালে শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার প্রথা ছিল এবং মুখে মুখে তা গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হত। এই অবস্থায় কোনও লিপির আবশ্যকতা ছিল না; অতএব ব্রাহ্মী লিপিকে নমস্কার করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখন ও পঠন পরম্পরা চালু হয়। তাই এই নমস্কার তৎকালীন যুগের মানুষের জন্য নয়; লিখন পরম্পরা চালু হওয়ার পর থেকে যারা শ্রুতচর্চা করছেন, তাঁদের জন্যই এই অংশটি সংযুক্ত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে আগমের সংকলনকর্তা গণধর ভগবান এই নমস্কার-পঙ্ক্তিটি রচনা করেন নি; আগম লেখার সময় কোনও লিপিকার ভক্ত এটি যুক্ত করে দিয়েছেন।

ব্রাহ্মীলিপিকে নমস্কার করার কারণ হল, বর্তমান অবসর্পিণীর আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেব স্বয়ং নিজ কন্য ব্রাহ্মীকে এই লিপি শিখিয়েছিলেন এবং রাজকন্যা ব্রাহ্মীর নাম অনুসারেই এই লিপির নাম হয় ব্রাহ্মী লিপি। অতএব, প্রত্যেক জৈনের কাছে এই লিপির জন্য একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। লিখিত আগম শাস্ত্র ব্রাহ্মীলিপিতে লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে আধুনিক মানুষদের জন্য শ্রুতজ্ঞান প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাই এই নমস্কার।

(ক্রমশঃ)